স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক সাময়িকী
৭ম বর্ষ ❑ তৃতীয় সংখ্যা ❑ ফেব্রুয়ারি-মার্চ ২০১৮

সম্পাদক
ডা. পুণ্যব্রত গুণ
ডা. জয়ন্ত দাস

সম্পাদকমণ্ডলী
ডা. পার্থপ্রতিম পাল ❑ ডা. সুমিত দাশ
প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায় ❑ ডা. কুশল সেন

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা
ডা. অভিজিৎ পাল ❑ ডা.অমিতাভ চক্রবর্তী
ডা. অনুপ সাধু ❑ ডা.আশীষ কুমার কুণ্ডু
ডা. চঞ্চলা সমাজদার ❑ ডা.দেবাশিস চক্রবর্তী
ডা. শর্মিষ্ঠা দাস ❑ ডা.শর্মিষ্ঠা রায়
ডা. তাপস মণ্ডল ❑ ডা.সোহম সরকার

বিন্যাস ও অঙ্গসজ্জা ❑ মনোজ দে, গোপাল সরকার,
ডা. কুশল সেন,
দুনিয়া গঙ্গোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ ❑ উৎপল বসু

বিনিময় ২০ টাকা

প্রকাশক
গোপাল সরকার
স্বাস্থ্যের বৃত্তে-র তরফে
দাসপাড়া (আংশিক), পূর্ব বুড়িখালি, বাউরিয়া
উলুবেড়িয়া
হাওড়া ৭১১৩১০

মুখ্য পরিবেশক
বিশাল বুক সেন্টার
৪ টোটি লেন, কলকাতা ৭০০০১৬
ফোন: ৪০৬৪-৪০৯৭/৪১০৩

মুদ্রক
এস এস প্রিন্ট, নরসিংহ লেন, কলকাতা ৭০০০০৯

চিকিৎসা বি(লে)ভ্রাট

এই বিল আইনে পরিণত হলে বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসাবিদ্যায় পাশ-করা ডাক্তারদের নিয়ন্ত্রক সংস্থা মেডিক্যাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া তুলে, তার জায়গা নেবে মূলত সরকার মনোনীত সদস্যদের নিয়ে তৈরি ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশন। স্বল্প সময়ের প্রশিক্ষণে হোমিওপ্যাথ বা আয়ুর্বেদ চিকিৎসকরা আধুনিক ওষুধ লেখার লাইসেন্স পাবে। ছাত্রের কাছ থেকে ফি বাবদ যত খুশি টাকা নিতে পারবে বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ। লিখেছেন **ডা. কৌশিক দত্ত**।

৪

কোমরের ব্যথা ও পা বরাবর নামা ব্যথা

দৈনন্দিন কিছু সহজ পদক্ষেপ নিলে অনেক সময় এই ব্যথার আক্রমণ থেকে নিজেদের অনেকটাই বাঁচানো যায়—যেমন মোটা না-হওয়া, অ্যারোবিক ব্যায়াম। এছাড়া যে সব কাজ একভাবে টানা করতে হয়, তার মাঝে বিরতি নেওয়া, ভারী জিনিস তোলার দরকার হলে ঠিকভাবে তোলা, ইত্যাদি। লিখেছেন **ডা. মৃন্ময়**।

১২

মদ খেয়ে লিভার খারাপ

মদ-খাওয়ার কথা শুনলেই আমাদের মনে হয়, লিভার বিগড়ে যাবে না তো? মদ খাবার সঙ্গে লিভার খারাপের সম্পর্ক সত্যিই কি এতটা বেশি? লিভার খারাপ হবার লক্ষণ কী কী? কী করলে লিভার খারাপ আটকানো যায়? লিখেছেন **ডা. দীপংকর জানা**।

১৮

বিষম খেয়ে মৃত্যু আর নয়

গলায় খাদ্য বা অন্য কিছু আটকে বিষম লাগা খুব সাধারণ ঘটনা, আর তা থেকে মৃত্যু হতে পারে। সহজ একটি পদ্ধতি, হেমলিক প্রকৌশল দিয়ে এরকম মৃত্যু ঠেকাতে পারেন আপনিও। লিখেছেন **সৌম্য সেনগুপ্ত**।

২৩

নারী-শিশুর ওপর যৌন নির্যাতন

সম্প্রতি এক স্কুলের ছোট্ট বাচ্চার ওপর যৌন নির্যাতন নিয়ে খুব হই-চই হয়ে গেল। অনেক বাবা-মা-ই অপরাধীকে শাস্তি দিতে না-পেরে বাচ্চার গতিবিধি রুদ্ধ করেন, তাতে ক্ষতি বাড়ে। তাহলে এটা ঠেকানোর পথ কী? লিখেছেন মনোবিদ **রুমঝুম ভট্টাচার্য**।

৩৬

স্বাস্থ্যের বৃত্তে পত্রিকায় স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সংক্রান্ত লেখা জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হয়। এইসব লেখা পড়ে কেউ নিজের বা অন্যের চিকিৎসা করবেন না, করলে সেই চিকিৎসার ফলে যে অসুবিধা বা বিপদ ঘটতে পারে, তার দায় সম্পূর্ণভাবে সেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির। *স্বাস্থ্যের বৃত্তে* সেজন্য কোনোভাবেই দায়ী থাকবে না।

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়		৩
চিকিৎসা বি(ল)ভ্রাট	ডা. কৌশিক দত্ত	৪
রোগী-ডাক্তার সম্পর্ক ও দু-চারটে গল্পগাছা	ডা. ঐন্দ্রিল ভৌমিক	৮
সিদ্ধান্তহীনতা ও মৃত্যুর অনিবার্যতা	ডা. পার্থপ্রতিম পাল	১০
কোমরের ব্যথা ও পা বরাবর নামা ব্যথা	ডা. মৃন্ময়	১২
মদ থেকে লিভার খারাপ	ডা. দীপংকর জানা	১৮
কানের পর্দায় ফুটো	ডা. অপূর্ব	২১
বিষম খেয়ে মৃত্যু আর নয়	সৌম্য সেনগুপ্ত	২৩
অমনোযোগী দুরন্ত বাচ্চার সমস্যা	ডা. সুমিত দাশ	২৮
নবজাতকের মাথায় খুশকি	ডা. জয়ন্ত দাস	৩০
কুসুমবাই-সন্দীপ্তাকে মনে রেখে মেয়েদের স্বাস্থ্যভুবন		৩১
ডা. হৈমবতী সেন-এর দিনলিপি থেকে	প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়	৩২
নারী-শিশুর ওপর যৌন অত্যাচার	রুমঝুম ভট্টাচার্য	৩৬
জন্মের কতক্ষণ পর শিশুর নাড়ি কাটা উচিত?	ডা. কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়	৩৮
স্ত্রী-জননাঙ্গে ছত্রাক সংক্রমণ	ডা. কুশল সেন	৪০
চিকিৎসকের চোখে অক্টোবর বিপ্লব	ডা. অরুণ সিং	৪২
সন্দীপ্তা চ্যাটার্জী স্মৃতি বক্তৃতা		
স্বাস্থ্যের অধিকার রক্ষার সংগ্রামে চিকিৎসক	ডা. রেজাউল করিম	৪৪
ডাক্তার কবে আসবে রোগীর কাছে?		৪৭
দেশ বিদেশের বস্তি জীবন ও স্বাস্থ্য সমস্যা	ধ্রুবজ্যোতি দে	৪৮
শহরের বাতাস কতটা শ্বাসযোগ্য	দেবনীল দে	৫১
তালা-চাবির গপ্পো	ডা. সব্যসাচী সেনগুপ্ত	৫৩
চিঠি		৫৬

বাণিজ্যিক নয়, মানবিক

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য, রোগ, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও সমাজ নিয়ে আপনার সহমর্মী দ্বিমাসিক বাংলা পত্রিকা

প্রাপ্তিস্থান

কলেজ স্ট্রিট অঞ্চল

পাতিরাম
বুকমার্ক
পিপলস বুক সোসাইটি
বই-চিত্র
মনীষা গ্রন্থালয়
নিউ হরাইজন বুক ট্রাস্ট

কলকাতার অন্যত্র

অমর কোলে-র স্টল (বিবাদি বাগ)
এস কে বুকস (উল্টোডাঙা)
লেখনী, ২/৪৬ নাকতলা, কলকাতা ৭০০ ০৪৭
কল্যাণদার স্টল (রাসবিহারী মোড়)
বইকল্প (ঢাকুরিয়া)
দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটি (উত্তর কলকাতা)
জ্ঞানের আলো (যাদবপুর, কলকাতা ৩২)

কলকাতার বাইরে

শ্রমিক কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্য কেন্দ্র (চেঙ্গাইল)
ধানসিড়ি (রায়গঞ্জ)
জাতিস্মর ভারতী (জলপাইগুড়ি, ফোন ৯৯৩২৩৫৪৯৫৮)
প্রয়াস মল্লভুম (লোকপুর, বাঁকুড়া, ফোন ৯৪৩৪২২৭৪৯৯)
মাধব পেপার স্টল (বালুরঘাট বাসস্ট্যান্ড, ফোন ৯৯৩২৫৫২৪৪)
প্রদীপন গাঙ্গুলি (দার্জিলিং, ফোন ৮৫৩৫৮৯৫৩৯২)
আনন্দম (মাথাভাঙা, বরুণ সাহা, ফোন ৯৪৩৪৩৩৭৭৬৮, ৯৭৩৩১১৬৪৪২)
সোমা দত্ত (হাওড়া, ফোন ৯১৪৩২৪৫৯৩৭)
ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি (বাগনান, ফোন ৯৮৩০৬০৩০২৯)
ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি (রাধানগর শাখা, বাঁকুড়া, ফোন ৯৪৭৪৫৬৫০৪৭)

শিয়ালদহ ও হাওড়া মেন সেকশনের বিভিন্ন স্টেশনের বই-এর স্টলে।

পাঠক ও লেখক পত্রিকার লেখার বিষয়ে যোগাযোগ করুন: ৯৮৩০৯২২১৯৪, ৯৩৩১০১২৫৩৭

পত্রিকা পাওয়ার জন্য পাঠক ও এজেন্টরা যোগাযোগ করুন: ৯৮৩০৮৮৬৪৪১, ৯৪৭৭০২৮১৫৭

ইমেল: swasthyerbritte@gmail.com

স্বাস্থ্যের বৃত্তের গ্রাহক হোন।

সডাক গ্রাহক চাঁদা ৬টি সংখ্যার জন্য ১৮০ টাকা।

Swasthyer Britto-র নামে চেক বা ড্রাফট পাঠান এই ঠিকানায়-
এইচ এ ৪৪, সল্টলেক, সেক্টর ৩, কলকাতা ৭০০ ০৯৭
আউটস্টেশন চেকে ৩০ টাকা আরও যোগ করুন

অথবা

NEFT-র মাধ্যমে টাকা পাঠান এই অ্যাকাউন্টে
Swasthyer Britto
A/c No. 0315101025024
Canara Bank, Princep Street Branch
IFSC Code: CNRB0000315

সেদিনই NEFT Transaction Id ও গ্রাহকের নাম-ঠিকানা, ফোন বা SMS করে জানান এই নম্বরে ৯৮৩০৮৮৬৪৪১

সম্পাদকীয়

ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশন বিল

ডাক্তারি পড়তে ঢুকতে গেলে জয়েন্ট এন্ট্রান্স দিতে হয়, আর তাতে চান্স পাওয়া বেশ শক্ত। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের হাত থেকে আস্তে আস্তে এইরকম পরীক্ষা নেবার ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে সারা ভারতে একটিই সাধারণ এন্ট্রান্স পরীক্ষা (NEET) চালু করেছেন, আর তাতে কেন্দ্রীয় শিক্ষা বোর্ড (CBSE)-এর পাঠক্রম অনুসারে প্রশ্নপত্র হচ্ছে। ফলে গ্রাম মফস্সলের সাধারণ ঘরের মেধাবী ছেলেমেয়েদের ডাক্তারি পড়ার সুযোগ আরও কমেছে।

এদিকে দেশে যত ডাক্তার থাকার কথা তার চেয়ে কম ডাক্তার আছে, এতটাই কম যে প্রাইভেট ডাক্তারি কলেজ খুলে দেদার ব্যাবসা করতে দিয়েও ঘাটতি পূরণ হচ্ছে না। অন্যদিকে দেশে কর্পোরেট হাসপাতাল বাড়ছে, সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থার হাঁড়ির হাল দেখে মানুষ ঘটিবাটি বেচেও প্রাণের দায়ে সেখানে চিকিৎসা করাচ্ছেন। সেখানে সস্তায় ডাক্তার পেলে মালিকের পোয়াবারো।

এমন অবস্থায় এ-বছরের দ্বিতীয় দিনে লোকসভায় কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশন বিল পেশ করলেন, যদিও এ নিয়ে আলোচনা চলছিল অনেকদিন ধরে। এ এক মাস্টারস্ট্রোক! হোমিওপ্যাথি আয়ুর্বেদ ইউনানি ইত্যাদি যা যা চিকিৎসাবিদ্যা এদেশে চালু আছে তার সব কিছুর ছাত্রদের কলেজ থেকে পাশ করার পর সংক্ষিপ্ত একটি প্রশিক্ষণ দিয়ে, সেইসব প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের একটা তালিকা তৈরি করে, তাঁদের অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তারি করতে দেওয়া হবে।[১]

এতদিন মেডিক্যাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া এই অ্যালোপ্যাথি ডাক্তারির শিক্ষাব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করত, ডাক্তারদের তালিকা রাখত ও দোষত্রুটির জন্য তাদের শাস্তি দিত। সে ব্যবস্থা যে পুরো ঠিক ছিল তা নয়, ডাক্তারদের মধ্যে থেকে নির্বাচিত হওয়া সত্ত্বেও ঘুষ ইত্যাদি দুর্নীতির দায়ে কাউন্সিলের এক প্রধানকে জেলে যেতে হয়েছিল। কিন্তু এখন সবরকমের ডাক্তারিকে একসাথে নিয়ন্ত্রণ করবে ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশন, যার প্রায় সব সদস্যই সরকার মনোনীত। এই সংস্থা চিকিৎসা শিক্ষা ও চিকিৎসকদের নৈতিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন।

চিকিৎসকদের মধ্যে যাঁরা সরাসরি মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাশ করে বেরিয়েছেন, তাঁদের একটি নতুন পরীক্ষা দিতে হবে। পাশ করলে তাঁরা এদেশে ডাক্তারি করার যোগ্য বিবেচিত হবেন। তাঁদের একটি রেজিস্টার থাকবে। অথচ বিদেশ থেকে পাশ করা ডাক্তারদের এই নতুন পরীক্ষা না দিয়েই ডাক্তারি করার অনুমতি দিতে পারবে ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশন! বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের শতকরা ৪০% ছাত্রের ফি ন্যাশনাল কমিশন স্থির করবে, বাকি ৬০%-এর ফি কলেজ নিজেই ঠিক করবে। অর্থাৎ কোটি কোটি টাকা দিয়ে দেশ ও বিদেশ থেকে ডাক্তারি ডিগ্রি কেনা হবে, আর শেষ পর্যন্ত ঐ টাকাটা রোগীর পকেট থেকেই উশুল করা হবে।

আমাদের মতে, সবচেয়ে ক্ষতি হবে সাধারণ মানুষ, বিশেষত গরিব মানুষের। তাঁদের জন্য গ্রামীণ ও পরিকাঠামোহীন এলাকার চিকিৎসক ঘাটতি মেটাতে হোমিওপ্যাথ আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকদের সামান্য ট্রেনিং দিয়ে কাজে লাগানো হবে। গরিব মানুষদের জন্য এরকম পরিষেবার ব্যবস্থা করে সরকার দেখাবে ডাক্তারের সমস্যা নেই। অথচ যেহেতু এঁদের মূল শিক্ষা অ্যালোপাথিতে নয় তাই ভুলভ্রান্তি হবে বিস্তর। ওষুধ কোম্পানির লাভ বাড়বে, কেননা অ্যালোপ্যাথিক ওষুধের মূলনীতি না জানার ফলে এঁরা সহজেই কোম্পানির প্রচারের শিকার হবেন, অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর ওষুধের ব্যবহার বেড়ে যাবে। এক কথায় স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বিপর্যয় হবে।

সর্বজনীন স্বাস্থ্যে বিনিয়োগ বাড়ালে ও স্বাস্থ্যের অধিকারকে আইনি স্বীকৃতি দিলে ডাক্তারি নিয়ে ব্যাবসা বন্ধের পথে এগোনো যেত, আর সরকার দেশের জিডিপি-র মাত্র তিন শতাংশ খরচ করেই সবার জন্য বিনা পয়সায় বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারত। সরকার জেনেবুঝেই তার ঠিক উলটো পথে হাঁটছে। বিরোধিতার মুখে পড়ে এখন ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশন বিল সংশোধনের জন্য স্ট্যান্ডিং কমিটিতে পাঠানো হয়েছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওপর-ওপর সামান্য কিছু এদিক-সেদিক করে এই বিলটাই আবার লোকসভায় পেশ করা হবে।

এই বিলের আক্রমণ ঠেকাতে কী করবেন সেটা আপনারাই ঠিক করুন।

১. অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তারি শব্দবন্ধটা অবশ্য ভুল, আসলে এটা হল বৈজ্ঞানিক ডাক্তারি। কিন্তু অ্যালোপ্যাথি কথাটা এদেশে খুব প্রচলিত, সহজে বোঝানোর জন্য ভুল কথাটাই তাই ব্যবহার করতে হল।

চিকিৎসা বি(ল)ভ্রাট

ডা. কৌশিক দত্ত

ডাক্তারি পড়তে গিয়ে যে ক-টা অত্যাচারের মোকাবিলা করতে হয়েছে তার মধ্যে একটা হল Health for All by 2000 AD শীর্ষক ১৯৭৮ সালের Alma Ata World Conference-এর ঐতিহাসিক ঘোষণাটি মুখস্থ করা। মুখস্থ বিদ্যায় কোনোকালে স্বচ্ছন্দ ছিলাম না। তার ওপর আমাদের কমিউনিটি মেডিসিনের শিক্ষক এসব ঘোষণা আর ডেফিনিশন কমা ফুলস্টপ সমেত মুখস্থ করার প্রয়োজনীয়তায় এমন ধর্মীয় আস্থা পোষণ করতেন যে ভয়ের চোটে আরও বেশি করে গুলিয়ে যেত শব্দগুলো। নীরবে সহ্য করিনি তা বলে, ২০০৬ সাল নাগাদ একবার প্রাক্তন কলেজে বেড়াতে গিয়ে সেই প্রফেসরের সঙ্গে দেখা। সবিনয়ে প্রশ্ন করলাম, 'এখনও মুখস্থ করাচ্ছেন স্যার, সেই Health for All by 2000 AD? সালটা একই আছে?' স্যার কিছু বললেন না। সকলের জন্য স্বাস্থ্যের স্বপ্নের টার্গেট ততদিনে 'বাই দ্য এন্ড অব দ্য থার্ড মিলেনিয়াম' বলে মনে হচ্ছিল। তবু বোধহয় সেসব দিন ভালো ছিল আজকের চেয়ে। সর্বজনীন স্বাস্থ্যের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য কোনো আন্তরিক সরকারি পরিকল্পনা ছিল না ঠিকই, কিন্তু স্বপ্নটাকেই প্রকাশ্যে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবার ঔদ্ধত্যের প্রদর্শন ছিল না। এখন যেন ভাঙাচোরা মিনিবাসের উদ্ধত কন্ডাক্টর ভিড়ে হোঁচট খাওয়া বিভ্রান্ত যাত্রীদের আঙুল উঁচিয়ে ধমক দিয়ে বলছে, 'চলুন চলুন, পিছন দিকে এগিয়ে যান।'

জনস্বাস্থ্য বিষয়ে সরকারি উদাসীনতার অজস্র উদাহরণ দেওয়া যায়। স্থানাভাবে সংক্ষেপে শুধু স্বাস্থ্যখাতে খরচার হিসেবটুকু দেওয়া যায়। জাতীয় আয়ের ৫% স্বাস্থ্যখাতে খরচা করতে পারলে ভালো। উন্নতিশীল দেশের পরিকাঠামো এবং পরিষেবায় এত সংস্কার প্রয়োজন, যে এর থেকে কমে হয় না। প্রশ্ন উঠতে পারে যে উন্নতিশীল দেশগুলি অপেক্ষাকৃত দরিদ্রও তো বটে। দেশের জন্য অতি প্রয়োজনীয় বোমা-বন্দুক, ক্রিকেটের সরঞ্জাম, এরোপ্লেন, ইত্যাদি কেনার পর পাঁচ শতাংশ স্বাস্থ্যের মতো গ্ল্যামারহীন ক্ষেত্রে ব্যয় করা কীভাবে সম্ভব? সেসব দিক বিবেচনা করার পরেও ভোর কমিটি, শ্রীনাথ রেড্ডি কমিশন, সকলেই জোর দিয়ে বলেছেন ৫% যদি নাও পারা যায়, অন্তত ৩% যেন অবশ্যই স্বাস্থ্যে বিনিয়োগ করা হয়। বাস্তবে ভারত নিজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আর্থিকভাবে মাত্র ১.৩৬% বরাদ্দ। এই ১.৩৬ শতাংশের একটি বড়ো অংশ অপব্যয় হয় পরিকল্পনা এবং নিয়ন্ত্রণের অভাবে। বহুস্তরীয় চৌর্যবৃত্তি সম্বন্ধে কিছু না বলাই বিধেয়। এসব বিষয়ে মুখ খুললে জেল-জরিমানা থেকে প্রাণ সংশয় অব্দি হতে পারে সরকারি চিকিৎসক ও চিকিৎসা কর্মীদের। অর্থাৎ জাতীয় আয়ের এক শতাংশেরও কম

চিকিৎসা পরিষেবাকে বিক্রয়যোগ্য পণ্য হিসেবে ক্রমশ ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দেবার প্রচেষ্টা অন্তত তিন দশক ধরে চলছে। সরকার স্বাস্থ্য পরিষেবা যথার্থভাবে দিতে অপারগ বলেই শুধু নয়, দিতে অনিচ্ছুক বলেই এই প্রচেষ্টা।

(সঠিকভাবে) ব্যয় করে দেশের সামগ্রিক স্বাস্থ্য পরিষেবা চালানো হচ্ছে। তার মধ্যে টিকাকরণ, সারভেইলেন্স, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে সর্বোচ্চ মেডিক্যাল কলেজের পরিষেবা অব্দি সবই রয়েছে।

কোনো দলের কোনো সরকারই এই বিষয়ে যথেষ্ট সদিচ্ছার পরিচয় দেননি। বর্তমান সরকার প্রথম সুযোগেই স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় আগের চেয়েও কমিয়ে নিজেদের অভিপ্রায় স্পষ্ট করে দিয়েছেন। অতি সম্প্রতি সেই অভিপ্রায় বিষয়ে সকলকে নিঃসন্দেহ করার জন্য পেশ করেছেন ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশন বিল। বিলটির সমস্যা বোঝার জন্য দু-টি বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করে নেওয়া উচিত।

এক: চিকিৎসা পরিষেবাকে বিক্রয়যোগ্য পণ্য হিসেবে ক্রমশ ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দেবার প্রচেষ্টা অন্তত তিন দশক ধরে চলছে। সরকার স্বাস্থ্য পরিষেবা যথার্থভাবে দিতে অপারগ বলেই শুধু নয়,

দিতে অনিচ্ছুক বলেই এই প্রচেষ্টা। উলটো করে এও বলা যায় যে স্বাস্থ্য ব্যবসায়ে পুঁজিপতিদের যথেষ্ট মুনাফার সুযোগ দিতে চান বলেই সরকারের তরফে জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের এই অনীহা। এই অনীহাটুকুই শুধু নয়, গত তিন দশকে স্বাস্থ্য বিষয়ক যেসব আইন প্রণীত হয়েছে এবং যেভাবে তার প্রয়োগ হয়েছে, তার একটা বড়ো অংশের মূল উদ্দেশ্য পুঁজির ক্রীড়াক্ষেত্রটিকে প্রসারিত ও মসৃণ করা।

দুই: মানুষকে শোষণ করতে হলে বিসমার্কীয় ডিভাইড অ্যান্ড রুল নীতির প্রয়োগ অতি ফলপ্রসূ, তা আমাদের রাজনীতিবিদেরা খুবই ভালো জানেন। জনগণের মধ্যে এই বিভাজন ভাষা, বর্ণ, জাত, ধর্ম, ইত্যাদির ভিত্তিতে হতে পারে। ক্ষেত্রবিশেষে কর্মের ভিত্তিতেও। আবার বঞ্চনাকারী রাজা যদি জনরোষ থেকে বাঁচতে চান, তবে সহজ উপায় হল একটি রাক্ষসের মূর্তি নির্মাণ করে মানুষের সামনে উপস্থিত করা, যাতে ক্ষুব্ধ মানুষ তাকেই আক্রমণ করে। মড়কে বিধ্বস্ত প্রত্যন্ত আদিবাসী গ্রামে যেভাবে আক্রান্ত হতেন ডাইনি চিহ্নিত বিধবা মহিলারা (যাঁদের সম্পত্তি কেড়ে নেওয়াও ছিল বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একটি গোপন উদ্দেশ্য), আধুনিক নাগরিক ভারতে তেমনি জানগুরুর আদেশে দণ্ডিত ডাইনের নাম 'ডাক্তার'। যেহেতু সহজে অ্যালিয়েনেট করতে পারার মতো টার্গেটকেই এসব ক্ষেত্রে নির্বাচন করতে হয়, তাই আয়ুর্বেদিক, যৌগিক, হেকিমি, যৌগিক চিকিৎসক বা ওঝা-গুণিনদের নয়, দানব সাজিয়ে আক্রমণ করার জন্য বেছে নেওয়া হয় পশ্চিমা বিজ্ঞাননির্ভর আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে (যার ইচ্ছাকৃতভাবে বিকৃত নাম 'অ্যালোপ্যাথি') প্রশিক্ষিত চিকিৎসকদেরই। চিকিৎসা পরিষেবার অন্দরে এই পরিকল্পিত ফাটল সৃষ্টির ফলে ডাক্তার-রোগী একজোট হয়ে আর সরকারের কাছে দাবিদাওয়া পেশ করতে পারবে না বা একযোগে কোনো অন্যায়কে প্রতিরোধ করতে পারবে না। আবার জনগণের যাবতীয় অসন্তোষ সামনে দৃশ্যমান চিকিৎসকের প্রতি ধাবিত হওয়ার সুযোগে প্রকৃত শোষকেরা অন্তরালে নিরাপদ থাকতে পারবেন। কীভাবে সংবাদমাধ্যম, রাজনৈতিক প্রচার, ইত্যাদি সবকিছুকে কাজে লাগিয়ে এই খলনায়ক নির্মাণের কুনাট্যটি মঞ্চস্থ হয়েছে তার বিস্তারিত আলোচনা আজ নয়। আপাতত এটুকুই বলার যে দীর্ঘ অধ্যবসায়ে সৃষ্ট এই অন্তর্দ্বন্দ্বকে কাজে না লাগাতে পারলে ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশন বিল পেশ করা এত সহজ হত না।

প্রস্তাবিত নতুন কমিশনে গণতন্ত্রের স্থান খুব কম। বদলে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ ভয়াবহ।

কী আছে এই বিলে, যা সমস্যাজনক? এত প্রতিবাদ কেন? দেখা যাক।

বর্তমান মেডিক্যাল কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া (এম সি আই), যা ১৯৫৬ সালে প্রণীত আইনানুসারে প্রতিষ্ঠিত ও নিয়ন্ত্রিত, তাকে বাতিল করে ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশন প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা চলছে। দেশের প্রচলিত যাবতীয় আইন এমনকী সংবিধান বদলে ফেলার সার্বিক উদ্যোগের অংশ হিসেবে একে দেখা যায়।

প্রথমে স্বীকার করে নেওয়া যাক যে এম সি আই বিপুল কর্মভারাক্রান্ত, তাদের কর্মপদ্ধতির মধ্যে কিছু ত্রুটি আছে এবং অন্যান্য বিভিন্ন সরকারি সংস্থার মতো এর মধ্যেও বেশ কিছু অনৈতিকতা আছে। কিছু কোরাপ্ট অধিকর্তার বিরুদ্ধে চিকিৎসকদের তরফ থেকেও প্রতিবাদ হয়েছে এবং কেতন দেশাইয়ের মতো ক্ষমতাধর ব্যক্তি অনৈতিক কাজকর্ম, আর্থিক অনিয়ম, ইত্যাদির জন্য হাজতবাসও করেছেন। অর্থাৎ সংস্থাটির সংস্কার প্রয়োজন ছিল এবং তা করাও হচ্ছিল, কিন্তু মাথাব্যথা সারাতে মাথা কেটে ফেলা উপযুক্ত শল্যচিকিৎসা কিনা, তা বুঝতে ডাক্তার হতে হয় না।

প্রস্তাবিত নতুন কমিশনে গণতন্ত্রের স্থান খুব কম। বদলে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ ভয়াবহ। বর্তমান ভারতীয় মেডিক্যাল কাউন্সিলে সব রাজ্যের মেডিক্যাল কাউন্সিল থেকে প্রতিনিধি থাকেন। নতুন বিলে সেই সুযোগ থাকছে না। নির্বাচনের ব্যাপারটা উঠে যাচ্ছে, বদলে আসছে মনোনয়ন। বর্তমানের ১৩৩ জন নির্বাচিত সদস্যের কমিটির স্থানে প্রতিষ্ঠিত হবে ২৫ জনের একটি কমিটি। তার মধ্যে মাত্র পাঁচটি রাজ্যের পাঁচজন নির্বাচিত প্রতিনিধি থাকবেন। সেই পাঁচটি রাজ্যকে বাস্তবে কীভাবে বেছে নেওয়া হবে, তা অনুমেয়। বাকি ২০ জন, অর্থাৎ আশি শতাংশ সদস্য হবেন কেন্দ্রীয় সরকার মনোনীত। অর্থাৎ সম্পূর্ণ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার ইচ্ছাধীন একটি ডামি সংস্থা গঠিত হবে। কোনো সদস্য স্বাধীন মত প্রকাশ করলে তাঁকে বদলে ফেললেই হল।

এই নতুন কমিশনে অচিকিৎসক সদস্যদের হাতে বিপুল ক্ষমতা। আমলা এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিরা নিয়ন্ত্রণের রাশটি হাতে নেবেন। এঁরাই চিকিৎসা পদ্ধতি, চিকিৎসার মান নির্ধারণ, চিকিৎসা শিক্ষার পাঠক্রম, ইত্যাদি বিষয়ে নিদান দেবেন। এমবিবিএস ফাইনাল ইয়ারের মেডিসিন বিষয়ক পরীক্ষা গোমূত্র বা পঞ্চগব্য বিষয়েই সব প্রশ্ন রাখা বাধ্যতামূলক হবে কিনা, তা এঁরাই স্থির করবেন ক্রমশ। এই কমিশনের শীর্ষে থাকবেন একজন অচিকিৎসক। অন্যান্য পেশার মানুষদের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখে প্রশ্ন করি, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির আসনে আইন বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ একজন চিকিৎসককে বসিয়ে দিলে কেমন হবে?

ডাক্তারি পড়তে ভর্তি হতে প্রবেশিকা পরীক্ষা লাগে। সেই বিষয়ে কী নীতি হতে যাচ্ছে, তা আদৌ পরিষ্কার নয়। একদিকে চালু হচ্ছে এক সর্বভারতীয় প্রবেশিকা, যাতে আইসিএসই এবং সিবিএসই পাঠক্রমের ছাত্রছাত্রীরা, হিন্দিভাষীরা এবং ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে পড়া ছাত্ররা অন্যান্য বোর্ডের এবং ভাষার স্কুলের পড়ুয়াদের চেয়ে সুবিধা পাবে। রাজ্যগুলির এবং আঞ্চলিক ভাষাগুলির ওপর এভাবে হিন্দি-ইংরেজি ও কেন্দ্রীয় পাঠক্রম চাপিয়ে দেওয়া (যা আদতে ফেডারেল স্ট্রাকচার বিলোপ করার এক বৃহত্তর প্রচেষ্টার অংশ) হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের

মান নিয়ন্ত্রণের নামে। অথচ বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলোকে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে ডাক্তার ছাপানোর টাঁকশালে পরিণত করার আয়োজন হচ্ছে। এমনকী আদৌ ডাক্তারি না পড়ে মডার্ন মেডিসিন প্র্যাকটিস করার ছাড়পত্র দেবার ব্যবস্থাও হচ্ছে।

ডাক্তারি পাশ করার পরেও সেই একইরকম ব্যাপার। সরকারি স্বীকৃত কলেজগুলো থেকে পাশ করার পর ইন্টার্নশিপ শেষ করা ছাত্রদের একটি একজিট পরীক্ষা দিতে হবে স্নাতকোত্তর পড়াশুনার ছাড়পত্র পেতে গেলে। এতে আপত্তির কী আছে? আপত্তি অস্বচ্ছতায়। আমরাও এমবিবিএস, এমডি, ডিএম, ইত্যাদি পড়ার জন্য প্রতি পদক্ষেপে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়েছি। সর্বভারতীয় পরীক্ষায় স্থানাধিকার করেই এমডি পড়তে গেছি। কিন্তু কী পরীক্ষা দিচ্ছি এবং কেন দিচ্ছি, তা পরিষ্কার ছিল। এই নতুন পরীক্ষাটির নাম দেওয়া হয়েছে একজিট একজাম। ধরা যাক, কোনো ছাত্র স্নাতকোত্তর পড়তে চায় না। সে কি এই পরীক্ষা দেবে? না দিয়েও কি সে জেনারেল প্র্যাকটিস করতে পারে? যদি সে এই পরীক্ষা দিয়ে অনুত্তীর্ণ হয়, তাহলেও কি এমবিবিএস হিসেবে প্র্যাকটিস চালিয়ে যেতে পারবে? পরবর্তীকালে আবার পরীক্ষা দিতে পারবে? কতবার? যদি শুধু স্নাতকোত্তর পড়ার জন্যই পরীক্ষা হয়, তাহলে এর নাম 'একজিট একজাম' কেন? এন্ট্রান্স টেস্ট বলা উচিত, যা আগেও ছিল। যদি এমবিবিএস পাঠ সম্পূর্ণ হয়েছে কিনা যাচাই করার জন্যই হয়, তাহলে রেজিস্ট্রেশন পাবার শর্ত হিসেবেই এটাকে দেখানো উচিত। মজার ব্যাপার হল, নিজেদের সরকারি কলেজগুলির মানের উপর সরকারের আস্থা নেই, তাই এই পরীক্ষার আয়োজন। অথচ কড়ি দিয়ে কেনা ডিগ্রি পবিত্র। ফরেন মেডিক্যাল গ্র্যাজুয়েটদের জন্য পরীক্ষা ছিল, যেমন প্রতি দেশেই থাকে। সেটা সম্ভবত তুলে দিতে চাওয়া হচ্ছে। না, এখনই সম্পূর্ণ তুলে দেওয়া হয়নি, তবে সরকার চাইলে বিনা পরীক্ষায় 'কিছুদিন' প্র্যাকটিস করার ছাড়পত্র দিতে পারেন। অথচ আমাদের অভিজ্ঞতায় এইসব প্রতিষ্ঠান থেকে পাশ করা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পার্থক্য বিস্তর। কিছু ছাত্রছাত্রী ভালো, অনেকে প্রায় কিছু শিখে আসার সুযোগ পাননি। সুতরাং সরকার কী চাইছেন, তা স্পষ্ট নয়।

বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলোর মান নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে আশঙ্কাজনক শিথিলতা সৃষ্টি করা হচ্ছে। এঁরা নিজেদের ইচ্ছামতো পরিকাঠামোয় ইচ্ছামতো আন্ডারগ্র্যাজুয়েট এবং পোস্টগ্রাজুয়েট সিট খুলতে পারবেন।

'সরকার চাইলে' কিছুদিনের ছাড়পত্র দেবার বিধানে স্বজনপোষণ ও ঘুষের দুর্নীতির জন্য জায়গা থাকছে। সরকার চাইলে অবশ্য শিশুদের দ্বারা শিশুচিকিৎসা করাতে পারেন, মানে পারছেন ইতোমধ্যে একটি রাজ্যে। এরকম চাওয়া চলতে থাকলে ভবিষ্যতে হয়তো টাকা দিয়ে চীন বা আজেরবাইজানের পরিকাঠামোহীন প্রতিষ্ঠান থেকে ডিগ্রি কিনে আনলে কোনো পরীক্ষা লাগবে না, জানতেও চাওয়া হবে না ছেলেটি বা মেয়েটি আদৌ কোনোদিন কলেজে গিয়েছিল কিনা।

বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলোর মান নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে আশঙ্কাজনক শিথিলতা সৃষ্টি করা হচ্ছে। এঁরা নিজেদের ইচ্ছামতো পরিকাঠামোয় ইচ্ছামতো আন্ডারগ্র্যাজুয়েট এবং পোস্টগ্রাজুয়েট সিট খুলতে পারবেন। তাদের গুণমান নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এমসিআই-এর নিয়মে কিছু বাড়াবাড়ি ছিল বলে অভিযোগ, যার দরুন বেশি বিনিয়োগের প্রয়োজন হচ্ছিল। এখন বাড়াবাড়ি রকমের কমাকমি করে

মাত্র ৪০% সিটের মূল্য নিয়ন্ত্রণ কিছুটা সরকারের হাতে থাকবে, বাকি ৬০% সিটে যথেচ্ছ দাম নেওয়া যাবে। আন্দাজ করা যায় পড়ার খরচ পাঁচ-দশ কোটি টাকা অব্দি হতে পারে। এই বিপুল অর্থ কারা ব্যয় করতে পারেন, তা আমরা জানি।

শোধবোধ করার চেষ্টা হচ্ছে বুঝি। ভেবে দেখা দরকার, নিয়ন্ত্রণ না থাকলে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান সর্বাধিক লাভের চেষ্টা করবে। যথেষ্ট শিক্ষক নিয়োগও করবে না। এই কলেজগুলোর ফি নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারটিও ছেড়ে দিতে চলেছেন সরকার। মাত্র ৪০% সিটের মূল্য নিয়ন্ত্রণ কিছুটা সরকারের হাতে থাকবে, বাকি ৬০% সিটে যথেচ্ছ দাম নেওয়া যাবে। আন্দাজ করা যায় পড়ার খরচ পাঁচ-দশ কোটি টাকা অব্দি হতে পারে। এই বিপুল অর্থ কারা ব্যয় করতে পারেন, তা আমরা জানি। এই অর্থ তাঁরা অপব্যয় করবেন না, ব্যাবসার বিনিয়োগ হিসেবে দেখবেন এবং পরবর্তীকালে সুদে-আসলে তা উশুল করতে চাইলে তাঁদের দোষ দেওয়াও যাবে না। আবার এঁদের অনেকেই নিয়ন্ত্রণহীন প্রাইভেট কলেজে অসম্পূর্ণ প্রশিক্ষণ পাবেন। কালক্রমে চিকিৎসা পরিষেবার ক্ষেত্রে দেশি বিদেশি প্রাইভেট কলেজ থেকে বিপুল অর্থমূল্যে ডিগ্রিপ্রাপ্ত চিকিৎসকের সংখ্যাধিক্য হবে বলে আশা করা যায়। সম্ভবত পরের ধাপে সরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলোর ঝাঁপ বন্ধ হবে। সেই সময়ের চিকিৎসা বাণিজ্য ক্রয় করার জন্য সকলে প্রস্তুত তো?

সরকারি বেসরকারি চিকিৎসা ও মেডিক্যাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বা চিকিৎসক অনিয়ম করলে তার শাস্তি বিধান করার জন্য এমসিআই নির্দিষ্ট নিয়ম মানতে বাধ্য ছিল। এই বিল অনুসারে মাত্র তিন সদস্যের একটি কমিটি নিজেদের ইচ্ছামতো পাঁচ কোটি থেকে একশো কোটি টাকা জরিমানা করতে পারবেন। প্রক্রিয়ার কোনো স্বচ্ছতা থাকছে না। অর্থাৎ আপনি যদি কোনোভাবে চিকিৎসা পরিষেবা বা চিকিৎসা শিক্ষার

সঙ্গে জড়িত হন, তাহলে সরকারের প্রতিটি কাজে (চিকিৎসা ক্ষেত্রের বাইরের কাজেও) আপনাকে 'জী হুজুর' বলতে হবে। নইলে একশো কোটি জরিমানা হতে পারে, যা ফাঁসির নামান্তর অধিকাংশের ক্ষেত্রে। একমাত্র অতি ধনী আর নির্দিষ্ট লবির খেলোয়াড়েরাই থাকবেন, বাকিরা বিলুপ্ত হবেন।

তাহলে এদেশে সাধারণ মানুষকে চিকিৎসা পরিষেবা দেবার মতো কেউ কি থাকবেন না? থাকবেন ক্রসপ্যাথি বিশেষজ্ঞরা। সরকার বলছেন হোমিওপ্যাথি, কবিরাজি, ইউনানি, এমনকী ন্যাচুরোপ্যাথি প্র্যাকেটিস করা যেকোনো চিকিৎসক মাত্র তিন সপ্তাহের ব্রিজ কোর্স করে মডার্ন মেডিসিন প্র্যাকটিস করতে পারবেন। অর্থাৎ তিন সপ্তাহে এক কোটি নতুন চিকিৎসক জোগান দেওয়া সম্ভব। ক্ষতি কী? ডাক্তারেরা আপত্তি করছেন কেন? ব্যাবসা মারা যাবার ভয়ে? অনেকের তেমন ধারণা, এবং ধারণাটা ভুল। তবে কি অহংকার? এটাও অনেকেই মনে করছেন এবং এই ধারণা কিয়দংশে ঠিক। ব্যক্তিগতভাবে আমার এই সমস্যাটিও নেই। খিদে কম, তাই ব্যাবসা খোয়ানো নিয়ে ভাবছি না। নিজেকে পণ্ডিত মনেও করি না। অন্যান্য প্যাথির ব্যক্তিদের চেয়ে নিজেকে উঁচুতে ভাবি না। তাহলে সমস্যা কোথায়?

ধরা যাক আয়ুর্বেদ, যার সম্বন্ধে আমি খুবই শ্রদ্ধাশীল। ব্যবসায়ী বুজরুক বাবাদের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে আয়ুর্বেদ নিয়ে সত্যিকারের গবেষণা হোক, এ আমার বহুদিনের ইচ্ছা। কিন্তু আয়ুর্বেদাচার্য যদি অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ লেখেন, তাহলে তা কি আর আয়ুর্বেদ থাকবে? একটি (প্রতি) ক্রিয়াহীন ঔষব্যবস্থা হিসেবে হোমিওপ্যথিতে অজস্র মানুষের বিশ্বাস। বিভিন্ন অটোকন্ট্রোল ডিজিজ হোমিওপ্যাথি ওষুধ খেলেও সেরে যায় এবং সেসবের জন্য অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ না

এঁদের দিয়ে যদি 'অ্যালোপ্যাথিক' ওষুধ (যা বিষাক্ত এবং ব্যর্থ বলেই এঁরা এতদিন প্রচার করে এসেছেন) লেখানো যায়, তবে কি চিকিৎসাটা আর হোমিওপ্যাথি থাকে?

খাওয়াই ভালো, এ প্রতিষ্ঠিত সত্য। এর বাইরে আর কোথায় কতটা কাজ করে এই প্যাথি, তা ভালো করে জানি না বলে এ নিয়ে তর্কও করি না এবং এই চিকিৎসকদের অসম্মানও করি না। প্রশ্ন একটাই, এঁদের নিজেদের কাজটা করতে দিলে হত না? এঁদের দিয়ে যদি 'অ্যালোপ্যাথিক' ওষুধ (যা বিষাক্ত এবং ব্যর্থ বলেই এঁরা এতদিন প্রচার করে এসেছেন) লেখানো যায়, তবে কি চিকিৎসাটা আর হোমিওপ্যাথি থাকে? ইউনানি, ন্যাচুরোপ্যাথি, রেইকি, ফেইথ হিলিং, সবকিছু সম্বন্ধে একই কথা।

এঁদের সকলের প্রতি আমরা শ্রদ্ধাশীল, তাই চাই এঁরা নিজেদের পদ্ধতিতে মূল্যবান পরিষেবা দিন। ইঞ্জিনিয়ারিং-এর তিন সপ্তাহের ব্রিজ কোর্স করে আমি যদি একটি ব্রিজ তৈরি করতে চাই ব্রহ্মপুত্রের ওপর, তবে সর্বভূতে সাম্যদর্শী ব্রহ্মজ্ঞানীও তা অনুমোদন করবেন না। তিনিও ইঞ্জিনিয়ার আর ডাক্তারে পার্থক্য করবেন। ব্রিজ কোর্স করা ইউনানি চিকিৎসক আধুনিক চিকিৎসার পদ্ধতিতে আপনার হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোকের চিকিৎসা করলেও আমার বানানো ব্রিজের মতো সেই স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থার ভেঙে পড়া অনিবার্য। আর এঁদের মান

এই ক-দিনে দেখলাম এই বিল এলে ডাক্তারদের খানিক 'বাঁশ' দেওয়া যাবে ভেবে অনেকে রীতিমতো উৎফুল্ল। ডাক্তার নামক আপদের যাত্রাভঙ্গ করতে পারার জন্য নিজেদের নাসিকা কর্তনেও রাজি অনেকেই।

নিয়ন্ত্রণ বা বিচার হবে কী করে? কোর্টে আজকাল চিকিৎসকদের শাস্তি দেবার যুক্তিতে বলা হয়, 'আপনি যে পদ্ধতিতে চিকিৎসা করেছেন, তা ২০১৬-র গাইডলাইনে ছিল ঠিকই, কিন্তু ২০১৭-র ডিসেম্বরে নিউ ইংল্যান্ড জার্নালে যে গবেষণাপত্র ছাপা হয়েছে, সেই অনুযায়ী আপনি পরিবর্তন করেননি। রুগী যেদিন ভর্তি হয়েছিলেন তার তিনদিন আগে প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও আপনি ৭২ ঘণ্টা সময় পেয়েও তা পড়েননি, অতএব . . . । ' এই মনোভাবের পাশে কোথায় রাখবেন তিন সপ্তাহের ডাক্তারি শিক্ষাকে? ব্রিজ কোর্স করা রেজিস্টার্ড চিকিৎসকদের কাছেও কি একই প্রত্যাশা রাখবেন? সেটা কি তাঁদের প্রতি প্রতি অন্যায় করা হবে না? এঁদের তবে বিচারের আওতার বাইরে রাখা উচিত। সেটা হবে তো?

আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকলে তার আকার বাড়তেই থাকবে। আপাতত ভাবনার সুতোটা আপনাদের হাতে ধরিয়ে দেওয়াটুকুই আমাদের কাজ। প্রতিরোধও অবশ্যই চিকিৎসকদের দায়িত্ব। প্রাথমিকভাবে তা করাও হয়েছে, কিন্তু কতদূর করা সঙ্গত। এই ক-দিনে দেখলাম এই বিল এলে ডাক্তারদের খানিক 'বাঁশ' দেওয়া যাবে ভেবে অনেকে রীতিমতো উৎফুল্ল। ডাক্তার নামক আপদের যাত্রাভঙ্গ করতে পারার জন্য নিজেদের নাসিকা কর্তনেও রাজি অনেকেই। চিকিৎসকদের আন্দোলনকে নিন্দা করে অতি কুৎসিত ভাষায় বক্তব্য রেখেছেন অনেকেই। পরিষেবার উপভোক্তারা যদি এটাই চান, তাহলে গায়ে পড়ে তাঁদের লড়াইটা লড়ে দেওয়া কতদূর সঙ্গত? সচেতন করা উচিত, করা হয়েছে। বলে ফেলা ভালো, এই লড়াইটা মূলত আপনাদের, রোগীদের এবং পরিজনের। সাধারণ মানুষের লড়াই। সবাই মিলে যদি না লড়েন, তবে একে একে একুশ দফা আইন তৈরি হবে। তারপর সন্ধ্যে ছ-টার আগে বিন-টিকিটে যদি হেঁচে ফেলেন ভুলক্রমে . . . স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. কৌশিক দত্ত, এমবিবিএস, এমডি, ডিএম, বিশেষজ্ঞ নিউরোলজিস্ট। একটি বেসরকারি হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত আছেন।

রোগী-ডাক্তার সম্পর্ক ও দু-চারটে গল্পগাছা

ডা. ঐন্দ্রিল ভৌমিক

গল্প ১

আজ একটা সত্যি গল্প শোনাব। আমার প্রথম সরকারি হাসপাতালের গল্প।

পাকা রাস্তা ছেড়ে আধ পাকা রাস্তা, তার পর লাল মোরামের রাস্তা, তারপর কাঁচা রাস্তা। তারপর আমাদের হাসপাতাল। হাসপাতালের নতুন বিল্ডিং। তার সামনে বিশাল এক পুকুর। তাতে হাসপাতালের ছায়া পড়ত। ঠিক যেন তাজমহল। বিকেল যত গভীর হত, ছায়াও তত দীর্ঘ হত। ধীরে . . . ধীরে . . . ধী . . . ঈঈঈ . . . রে . . . । ছায়া পুকুর পেরোনোর আগেই সূর্য ডুবে যেত। আর এক আকাশ ছায়াপথ নিয়ে রাত্রি হানা দিত হাসপাতালে।

এমনই এক বিকেলে যখন হাসপাতালের ছায়া পুকুরের মাঝামাঝি এসেছে তখনও অল্প আলোয় আমি পুকুর পাড়ে বসে পুঁটিমাছ ধরছিলুম। একজন বৃদ্ধ মুসলমান এসে বললেন, "ডাক্তারবাবু পেশেন্ট এনেছি। একটু হাসপাতালে যেতে হবে।"

যাঁরা এই অব্দি পড়ে ভাবছেন, শালা ডাক্তারটা কী ফাঁকিবাজ। ডিউটি আওয়ার্সে পুকুরপাড়ে মাছ ধরছে। শালাকে ধরে কেলানো উচিত। তাঁদের উদ্দেশ্যে জানাই, আমি ডিউটি আওয়ার্সে আরও অনেক গর্হিত কাজ করেছি। রীতিমতো ওয়ার্ডে টিভি লাগিয়ে ভারতকে বিশ্বকাপ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ান হতে দেখেছি। ডিউটি চলাকালীন হাসপাতালের

হাসপাতালে কোনো রোগী কি সুস্থ হয়নি? নিশ্চয়ই হয়েছে। কিন্তু আজ সাত বছর পরে আমার প্রথম হাসপাতাল নিয়ে ভাবতে বসে দেখছি শুধু সেসব হতভাগ্য রোগীর কথাই মনে পড়ছে আচমকা মৃত্যু এসে যাদের কেড়ে নিয়ে গেছে।

সকলে মিলে বহুবার ভাত আর মুরগির মাংসের পিকনিক করেছি। এমনকী আমি দুটো বিষ খাওয়া পেশেন্টকে গ্যাস্ট্রিক লাভাজ দেওয়ার মাঝের সময়ে ইয়ে . . . মানে পেয়ার-মহব্বত পর্যন্ত করেছি।

হ্যাঁ মশাই, ডাক্তাররা একটু ফাঁকিবাজই হয়। গল্প যদি না শুনতে চান, তাহলে আপনার আর পড়ার নেই। এখান থেকেই বিদায় নেন।

যাই হোক, যা বলছিলুম . . . বৃদ্ধের ডাকে হাসপাতালে গেলুম। তিনি নিজেই ভ্যান চালিয়ে নিজের ছোটো ছেলেকে নিয়ে এসেছেন। সেই ছেলের অবস্থা বড়োই করুণ। চামড়ার সাথে হাড় লেগে রয়েছে। বৃদ্ধ বললেন, "সকাল থেকে কেশে কেশে রক্ত তুলছে ডাক্তারবাবু। চার দাদা মিলে ভয়ের চোটে উঠানে নামায় দিছে। আপনি ওরে হাসপাতালে ভর্তি রাখেন ডাক্তারবাবু। রাখার হলে আল্লা রাখবে, মারার হলে আল্লা মারবে।"

তা আল্লা রাখল। পরেরদিন ল্যাব টেকনিশিয়ান শাহাউদ্দীনদা ডেকে দেখালেন, "এই দেখুন ডাক্তারবাবু, অ্যাসিড ফাস্ট ব্যাসিলাই একদম গিজ গিজ করছে। কালকে রক্ত পুরোপুরি বন্ধ হলে আরেকবার কফ পাঠান। তারপর টিবির ওষুধ শুরু করবেন।"

সাতদিন বাদে বৃদ্ধ ছেলেকে নিয়ে বাড়ি গেলেন। আরও পনেরোদিন বাদে হাসপাতাল থেকে টিবির ওষুধ নেওয়ার সময়ে আমার সাথে দেখা করে গেলেন। ছেলের চেহারা পালটে গেছে। অন্তত কেজি ছয়েক ওজন বেড়েছে। সেদিন সন্ধ্যেয় বৃদ্ধ এসে হাজির। সঙ্গে দুটো বিশাল শোল মাছ। আমি আপত্তি জানালাম। বৃদ্ধ জানালেন, নিতেই হবে। তার কাছে এছাড়া দেওয়ার মতো কিছুই নেই। তারা বড্ড গরিব। ইত্যাদি, ইত্যাদি . . . । বললাম, "এত বড়ো শোল মাছ নিয়ে কী করব?" "বৃদ্ধ বললেন, "জিইয়ে রাখবেন। ও মাছ মরবে না। পরে সবাই মিলে একদিন খাবেন।"

মাছ দুটো আমার ঘরের একটা বালতির মধ্যে রয়ে গেল। মুড়ি দিলে মুড়ি খায়। ভাত দিলে ভাত খায়। এমনকী আমি শশা, কলা এসবের টুকরো দিয়ে দেখলাম সেসবও খায়।

আমি যখন প্রায় শোল মাছ বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেছি সেই সময়ে একদিন আউট ডোর করছি। হঠাৎ শুনি বাইরে ভয়ানক কলরব। আমি আর ডাক্তার পীযূষ কান্তি পাল দৌড়ে গিয়ে দেখি টিউবয়েলের পাশে কলতলায় একটি যুবক উপুড় হয়ে পড়ে আছে। রক্তে পুরো কলতলা ভেসে যাচ্ছে। পীযূষদা কয়েকজনের সাহায্যে যুবকটিকে সোজা করল। ভালো করে দেখল। তারপর বলল, "এক্সপায়ার্ড।"

আমি তখন দেখছি পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সেই মুসলমান বৃদ্ধকে। মাথায় হাত ঠুকে তিনি বিলাপ করছেন। আমাকে দেখে বললেন, "কালকে থেকে আবার রক্ত উঠছিল ডাক্তারবাবু। আপনারে দেখাব বলে আনছিলেম। বদ নসিব। রক্ত মাখা মুখ ধুতে গিয়ে আচমকা কাশি উঠল। তারপরে পড়ে গেল।"

অনেক রাত্রে গোটা হাসপাতাল আর সমস্ত কোয়ার্টারগুলো যখন ঘুমাচ্ছে আমি সাপখোপের ভয় অগ্রাহ্য করে শোল মাছের বালতিটা নিয়ে পুকুরের পাড়ে এলাম। বালতিটা পুকুরের জলে উপুড় করে দিলাম।

হাসপাতালে কোনো রোগী কি সুস্থ হয়নি? নিশ্চয়ই হয়েছে। কিন্তু আজ সাত বছর পরে আমার প্রথম হাসপাতাল নিয়ে ভাবতে বসে দেখছি শুধু সেসব হতভাগ্য রোগীর কথাই মনে পড়ছে আচমকা মৃত্যু এসে যাদের কেড়ে নিয়ে গেছে।

বিজয় নয় মানুষ সারাজীবন পরাজয়ের স্মৃতি বহন করে।

সুখ নয়, গভীর দুঃখই মানুষের মনে দাগ কেটে যায়।

আমি আর কোনোদিনও ওই পুকুরে মাছ ধরতে পারিনি।

ওকে বললাম, জানিস তোর মাকে রাত দেড়টার সময় যে ডাক্তারবাবু দেখেছিলেন, তাঁর প্যান্ট ধরে যে বাচ্চাটি দাঁড়িয়েছিল, আমি এখন তাকে দেখাচ্ছি।”

গল্প ২

আজ চেম্বারে শেষ রোগী যখন দেখছি তখন রাত প্রায় সাড়ে এগারোটা। ভদ্রলোক সুগারের রিপোর্ট দেখাতে এসেছিলেন। বয়স পঁয়ষট্টির কাছাকাছি। রিপোর্ট দেখে ওষুধের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করার পর ভদ্রলোক বললেন, “আর কোনো রোগী নেই ডাক্তারবাবু। একটা গল্প শুনবেন।”

বললাম, “বলুন।”

ভদ্রলোক বলতে শুরু করলেন, “প্রায় ত্রিশ বছর আগের কথা। তখন আমার বয়স আপনারই কাছাকাছি। এক রাত্রে আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মা হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়ে পরলেন। প্রচণ্ড পেটে ব্যথা, সঙ্গে বমি। তখনকার মধ্যমগ্রামে এখনকার মতো এত হাসপাতাল ছিল না। ডাক্তারও ছিল না। বন্ধু আমাকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গেল। মাকে বারাসত হাসপাতালে নিয়ে যাবে।”

আমি মনে মনে ভাবলাম, কতক্ষণ এই গল্প চলবে কে জানে? বারোটা-র আগে থামলে হয়। স্ত্রীর আবার হাসপাতালে নাইট ডিউটি। মেয়ে দুটো বাড়িতে কী করছে কে জানে? বাবা মনে হয় এতক্ষণে দুই নাতনিকে নিয়ে নাকানিচোবানি খাচ্ছেন।

ওদিকে ভদ্রলোক বলেই চলেছেন, “তখন মধ্যমগ্রামে হাতে গোনা লোকের মোটর গাড়ি ছিল। অ্যাম্বুলেন্স-ট্যাম্বুলেন্স ছিল কল্পনারও বাইরে। বন্ধু অনেক কষ্টে একটা সাইকেল ভ্যান জোগাড় করেছে। এদিকে বর্ষাকাল। টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। এতটা রাস্তা এই অন্ধকারে বৃষ্টির মধ্যে কী করে যাওয়া হবে তাই নিয়ে সবাই আলোচনা করছে।”

আমি এবার ঘড়ির দিকে তাকালাম। উনি সেটা খেয়াল করলেন। বললেন, “বেশি সময় লাগবে না ডাক্তারবাবু। সংক্ষেপে বলছি। আসলে গল্পটা আপনাকে বলার লোভ কিছুতেই সামলাতে পারছি না। বন্ধুর মা তখন যন্ত্রণায় প্রায় গোঙাচ্ছেন। হঠাৎই ওদের এক আত্মীয়

বিজয় নয় মানুষ সারাজীবন পরাজয়ের স্মৃতি বহন করে। সুখ নয়, গভীর দুঃখই মানুষের মনে দাগ কেটে যায়। আমি আর কোনোদিনও ওই পুকুরে মাছ ধরতে পারিনি।

বললেন, রবীন্দ্রপল্লীতে একজন ডাক্তারি সবেমাত্র পাশ করে প্র্যাকটিস শুরু করেছেন। একবার ওনার কাছে গিয়ে দেখলে হয়।

বীরেশপল্লী থেকে ভ্যান নিয়ে স্টেশন পার হয়ে চললাম রবীন্দ্রপল্লীতে। রাত তখন প্রায় দেড়টা। ডাক্তারের বাড়ি খুঁজে পেতে কিছুটা সময় গেল। ডাকাডাকির পর ডাক্তারবাবু বেরোলেন। লম্বা, সুদর্শন, একমাথা অবিন্যস্ত চুল। আর ডাক্তারবাবুর প্যান্ট ধরে একটি তিন চার বছরের কালো ছেলে। সবে ঘুম ভাঙা চোখ দুটো একহাতে রগড়াচ্ছে।

ডাক্তারবাবু বন্ধুর মাকে দেখলেন। দুটো ইঞ্জেকশান দিলেন। বললেন, ইনডাইজেশন বলে মনে হচ্ছে। সকাল অব্দি দেখুন। আর লবণ চিনির সরবত খাওয়ান। ব্যথা না কমলে তখন হাসপাতালে ভর্তি করবেন। ডাক্তারবাবু পনেরো টাকা ভিজিট নিলেন। ব্যথা কমে গেছিল। বন্ধুর মাকে আর হাসপাতালে নিতে হয়নি। তিনি এখনও বহাল তবিয়তে বেঁচে আছেন।

আপনি ভাবছেন কেন আপনাকে খামখা এই গল্পটা শোনালাম? আসলে আগের দিন যখন আপনাকে দেখাতে এসেছিলাম, তখন আপনার বাবার পরিচয় আমি জানতাম না। কালকে সুগার পরীক্ষা করার জন্য যে ছেলেটি রক্ত নিচ্ছিল তার কাছে আপনার বাবার নাম শুনলাম। আপনার বাবা এবং বন্ধুর মাকে যে ডাক্তারবাবু দেখেছিলেন দুজনের নামই এক। ডা. পীযূষ পানি ভৌমিক। শুনে আমি এতটাই অবাক হয়েছি, যে কালকেই ওই বন্ধুর কাছে গেছিলাম। ওকে বললাম, জানিস তোর মাকে রাত দেড়টার সময় যে ডাক্তারবাবু দেখেছিলেন, তাঁর প্যান্ট ধরে যে বাচ্চাটি দাঁড়িয়েছিল, আমি এখন তাকে দেখাচ্ছি।”

ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, “আপনার বাবা এখন কেমন আছেন?”

বললাম, “ভালো। তবে এখনও রাতে বাড়িতে রোগী দেখার সময় একজন বাচ্চা ওনার প্যান্ট ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। আমি নই, আমার বড়ো মেয়ে।” স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. ঐন্দ্রিল ভৌমিক, এমবিবিএস, এমডি, একটি সরকারি হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক।

সিদ্ধান্তহীনতা ও মৃত্যুর অনিবার্যতা

সিদ্ধান্তহীনতার দোদুল্যমানতা আমাকে গ্রাস করছে, মৃত্যুর অনিবার্যতায় আমি হতাশ। লিখেছেন **ডা. পার্থপ্রতিম পাল**।

আমি একজন সাধারণ চিকিৎসক । আশপাশের লোকজন তাদের মতো ভেবে ছোটোখাটো চিকিৎসার জন্য আমার কাছে আসে। আমার কাজ হচ্ছে রোগীর প্রাথমিক চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা এবং রোগ লক্ষণ মিলিয়ে অন্য বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের কাছে অথবা অবস্থা সিরিয়াস হলে রোগীকে হাসপাতালে সুপারিশ করা।

সত্যি কথা বলতে কি, মধুমেহ বা উচ্চ রক্তচাপের মতো দীর্ঘস্থায়ী রোগের পুরোনো কিছু রোগীরা আমার কাছে আসে বটে তবে অম্বল বা অজীর্ণতা, জ্বর, সর্দি কাশি, গাঁটে ব্যথা ইত্যাদি যে সমস্ত রোগে তেমন বিপদের আশঙ্কা নেই বলে লোকে মনে করে সেই সব সাধারণ রোগের চিকিৎসাই আমি করি। রোগীর এখন-তখন অবস্থা হলে আমাকে অনেকেই বাড়িতে ডাকেন এবং অনেক ক্ষেত্রেই তার আগেই রোগীর জীবনাবসান ঘটে, আমার কিছুই করার থাকে না ।

তাই অন্য চিকিৎসক বা সাধারণ চিকিৎসকের মতোই আমারও হাসপাতালে আপৎকালীন বিভাগে যে ডাক্তারেরা প্রযুক্তি ব্যবহার করে বা না করে মানুষকে আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচায় তেমন মানসিক সন্তুষ্টি পাওয়ার উপায় নেই। হাসপাতালে যখন কাজ করেছি তখন অবশ্য এই সফলতার স্বাদ আমাদের অনাস্বাদিত ছিল না। হাসপাতাল ছাড়ার পরে গত ২৭ বছরের ডাক্তারি জীবনে যে অভিজ্ঞতা আমার ছিল না, ক-দিন আগেই মৃত্যুর গ্রাস থেকে একজন মানুষকে ফিরিয়ে আনার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল কিন্তু পরিস্থিতির অবশ্যম্ভাবী (!) পরিণতিতে আমরা দু-জনেই হেরে গিয়েছি। মৃত্যু থেকে ফিরে আসার পরও রোগীর আবার মৃত্যু হয়েছে।

মধ্যবয়সি একজন পুরুষ দু-দিন আগে আমার কাছে এসেছিলেন। তার খুব অস্থির আর দর্বল মনে হচ্ছিল। তিনি গতকাল রাতে অতিরিক্ত মদ খেয়েছিলেন, এছাড়া তাঁর অন্য কোনো অসুস্থতা ছিল না। আমি তখন রোগী দেখছিলাম এবং হঠাৎই একজন সাহায্যকারী দৌড়ে এসে আমাকে বলে বাইরে একজন রোগী মেঝেতে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি বাইরে এসে দেখি অবস্থা গুরুতর, রোগীর চোখ দাঁড়িয়ে গেছে, নাড়ি বন্ধ হয়ে গেছে, শ্বাসপ্রশ্বাস পড়ছে না। রোগীর মৃত্যু হয়েছে। প্রায় দু-তিন মিনিট রোগী এভাবে পড়ে আছেন। অগ্রপশ্চাৎ ভাবার সুযোগ ছিল না, তখনই রোগীকে রিসাসিয়েট করা শুরু করে দিই। চিত হয়ে শুয়েই ছিল, মাথাটা এক দিকে কাত করে মুখের ভিতরটা যতটা সম্ভব পরীক্ষা করে নিই, মুখের ভিতরে কিছু নেই। নিল ডাউন হয়ে রোগীর পাশে বসে শুরু করে দিই কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস চালু করার কাজ। রোগীর সঙ্গে আসা একজনকে রোগীর মাথার কাছে বসিয়ে কেমন করে তার শ্বাস রোগীর শ্বাসতন্ত্রে প্রবেশ করাতে হবে সেটা বলে দিই। রোগীর হৃৎপিণ্ডের উপর চাপ দিতে থাকি, জোরে আরও জোরে। কিছুক্ষণের মধ্যেই রোগী শ্বাস নিতে শুরু করেন। খুবই মৃদু। আমাদের কাজ চলতে থাকে। আর চলতে থাকে অ্যাম্বুলেন্স জোগাড় করার কাজ, অক্সিজেন জোগাড় করার কাজ।

আট-দশ মিনিট কেটে গেল, আমি রীতিমত হাঁপিয়ে উঠেছি, বুক ধড়ফড় করছে, শরীর অবশ হয়ে আসছে । আমি আর পারছি না । ওরা অ্যাম্বুল্যান্স জোগাড় করতে পারেনি, অক্সিজেন জোগাড় করতে পারেনি।

রোগীর হৃৎপিণ্ডের উপর চাপ দিতে থাকি, জোরে আরও জোরে। কিছুক্ষণের মধ্যেই রোগী শ্বাস নিতে শুরু করে। খুবই মৃদু। আমাদের কাজ চলতে থাকে।

অগত্যা বলেছিলাম একটা গাড়ি জোগাড় করতে—তাও পারেনি। অল্প অল্প করে রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাস চলছে সঙ্গে যাঁরা এসেছেন তাঁদের কেউ আমার কাজটা চালিয়ে যাবার সাহস দেখালেন না। আমার উপায় নেই, একটা টোটো ডেকে হাওড়া হাসপাতালে নিয়ে যেতে বললাম, যেমন করে পারে হৃদ্‌যন্ত্রে ম্যাসাজ চালিয়ে যেতে বলেছিলাম। কতটুকু করতে পেরেছে জানি না, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আগে পথেই রোগীর মৃত্যু হয়।

ঘটনার পর থেকে একটা প্রশ্ন অনবরত আমার মাথায় ঘুরছে । কোথাও কি খামতি থেকে গেল? রোগীকে বাঁচাতে আমার তরফে কি ঘাটতি থেকে গেল?

অনেকেই আমেরিকার 911 পরিষেবার কথা জানেন। উন্নত অনেক দেশেও এ ধরনের পরিষেবা চালু আছে। ওই নম্বর ডায়াল করলে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবস্থা সমন্বিত অ্যাম্বুলেন্স ও মানুষকে

আপৎকালীন বাঁচাবার প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মী কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে যায় দোরগোড়ায়। এ ব্যবস্থা এখানে আশা করা যায় না। একটা external defibrillator থাকলেও সেটা কাজ দিতে পারত। কিন্তু এটা বাহুল্য

হাসপাতাল ছাড়ার পরে গত ২৭ বছরের ডাক্তারি জীবনে যে অভিজ্ঞতা আমার ছিল না, ক-দিন আগেই মৃত্যুর গ্রাস থেকে একজন মানুষকে ফিরিয়ে আনার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল কিন্তু পরিস্থিতির অবশ্যম্ভাবী (!) পরিণতিতে আমরা দু-জনেই হেরে গিয়েছি।

এদেশে আমাদের মতো ডাক্তারদের এ যন্ত্র চেম্বারে রেখে চিকিৎসা চালাবার স্বপ্ন দেখাও যায় না। যতদূর জানি কৃত্রিম শ্বাস চালু করা গেলেও খুব কম সংখ্যক এ ধরনের রোগীকে বাঁচাতে পারা যায়। কিন্তু চিকিৎসকদের তো যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।

আমি কি রোগীকে সঠিক চিকিৎসা দিতে পারলাম? আমাকে কিছুটা বিশ্রাম দিতে পারবে এমন স্বাস্থ্যকর্মী পাশে রাখা কি আমার দায়িত্ব?

ঘটনার পর থেকে একটা প্রশ্ন অনবরত আমার মাথায় ঘুরছে । কোথাও কি খামতি থেকে গেল? রোগীকে বাঁচাতে আমার তরফে কি ঘাটতি থেকে গেল?

যতক্ষণ না হাসপাতালে সঠিক চিকিৎসা শুরু করা যাচ্ছে ততক্ষণ রোগীর সঙ্গে থেকে শ্বাস-প্রশ্বাস চালু রাখাটাও কি আমার দায়িত্বের মধ্যে ছিল বা রোগীর সঙ্গে আমারও কি হাসপাতালে যাওয়া উচিত ছিল? নীতিগত বা চিকিৎসাগতভাবে আমি কি ঠিক কাজ করলাম না কি ভুল করলাম?

পাঠক কী ভাবছেন? ডাক্তারেরা কী বলেন? বর্তমান আর্থ-সামাজিক তথা রাজনৈতিক এবং আইনি পরিমণ্ডলে আমার আর কী করা উচিত ছিল? স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. পার্থপ্রতিম পাল, এমবিবিএস, প্রাইভেট প্র্যাকটিশ করেন, *স্বাস্থ্যের বৃত্তে* পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলী-সদস্য।

Advt.

ধর্ম-জাতপাত-অযুক্তি-কর্তৃত্ব ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আপনার যুক্তিবাদী মননচর্চার দীর্ঘদিনের সাথী

একুশ শতকের যুক্তিবাদী

একুশ শতকের যুক্তিবাদী

ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির কেন্দ্রীয় মুখপত্র

৩১, প্রাণকৃষ্ণ সাহা লেন, বরানগর, কলকাতা - ৭০০ ০৩৬

যোগাযোগ ঃ ৯৮৩৬৪৭৭১৯৫, ৯৮৩০৬৭৩৫১২

এছাড়া কমবয়সীদের জন্য আছে আকর্ষণীয় গল্প-ফিচার-ছবিতে ঠাসা কিশোর যুক্তিবাদী

কোমরের ব্যথা ও পা বরাবর নামা ব্যথা

ডা. মৃন্ময়

কোমরের ব্যথা ও পা বরাবর নামা ব্যথা নিয়ে *স্বাস্থ্যের বৃত্তে*র আগের সংখ্যা (ডিসেম্বর ২০১৭-জানুয়ারি ২০১৮)-তে বিশদে আলোচনা হয়েছে, কিন্তু দৈনন্দিন কিছু সহজ ব্যবস্থা নিলে অনেক সময় এর আক্রমণ থেকে নিজেদের অনেকটাই বাঁচিয়ে রাখা যায়।

শরীরের ওজন সঠিক সীমার মধ্যে রাখা খুব জরুরি

দেহভর সূচক বা BMI (Body Mass Index)-এর মাধ্যমে ওজন সঠিক সীমার মধ্যে আছে কিনা তা বোঝা যায়। শরীরের ওজনকে শরীরের উচ্চতার বর্গ দিয়ে ভাগ করলেই এর মান পাওয়া যায়। শরীরের ওজন নিতে হবে কিলোগ্রামে (কেজিতে), আর উচ্চতা মাপতে হবে মিটারে। ধরা যাক ১৫০ সেন্টিমিটার বা ১.৫ মিটার কোনো লোকের ওজন ৬০ কেজি, তার BMI হবে $৬০/(১.৫)^২ = ২৬.৬৭$। স্বাভাবিকভাবে এই BMI ১৮.৫ থেকে ২৪.৯-এর মধ্যে থাকা উচিত। যদিও ভারতীয়দের ক্ষেত্রে এর মাপ ১৮.৫ থেকে ২২.৯-এর মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাছাড়া কোমরের পরিধি ছেলেদের ৩৭ ইঞ্চি ও মেয়েদের ৩১.৫ ইঞ্চির মধ্যে হওয়া দরকার। এই মোটা হওয়া আটকাতে কী কী করা দরকার ও বেশি ওজন হলে অন্যান্য কী ধরনের বিপদ হতে পারে তা এই পত্রিকার আগের সংখ্যায় বেশ খুঁটিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে বলার এইটুকুই যে "সাইড এফেক্ট ছাড়া ১ মাসে ১০ কেজি ওজন কমানোর" চক্করে না পড়াই ভালো, তা 'আয়ুর্বেদ', 'হোমিওপ্যাথি', 'অ্যালোপ্যাথি' বা 'মেশিনের সাহায্যে' যাই হোক না কেন। তার বদলে খাদ্যাভাস-এর পরিবর্তন করুন, নিয়মিত ব্যায়াম করুন, প্রয়োজনে পুষ্টিবিশারদের পরামর্শ নিন।

অ্যারোবিক ব্যায়াম

প্রাপ্তবয়স্কদের সপ্তাহে অন্তত ৫ দিন ৩০ মিনিট করে মাঝারি ধরনের অ্যারোবিক ব্যায়াম করা উচিত। এগুলোর উদাহরণ হল জগিং, দ্রুত ঘাম ঝরিয়ে হাঁটা, সাঁতার, সাইকেল চালানো, লাফদড়ি (স্কিপিং) করা, হালকা চালে ফুটবল বা কবাডি খেলা, ক্রিকেট খেলা (এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নয়), টেবল টেনিস, ভলিবল, বাস্কেট বল খেলা মাঝারি ধরনের অ্যারোবিক ব্যায়াম। এতে হৃদ্‌গতি বাড়ে, শ্বাস প্রশ্বাসের হার বাড়ে ও গরম লাগে।

মাঝারি ধরনের অ্যারোবিক ব্যায়াম হচ্ছে কিনা তা বোঝার একটি সহজ উপায় হল ব্যায়াম করতে করতে আপনার একটু কষ্ট হলেও কথা বলতে পারবেন কিন্তু সুর করে দু-লাইন গাইতে পারবেন না, দমে টান ধরবে।

যাঁদের পক্ষে সম্ভব তাঁরা সপ্তাহে অন্তত ৭৫ মিনিট কঠিন অ্যারোবিক ব্যায়াম করতে পারেন। তার ফল ১৫০ মিনিট মাঝারি অ্যারোবিক ব্যায়ামের সমান হবে। কঠিন অ্যারোবিক ব্যায়ামের উদাহরণ হল— দ্রুত সাঁতার কাটা, দ্রুত দৌড়ানো, রীতিমতো ফুটবল খেলা, সিঙ্গল লন টেনিস, হকি খেলা। কঠিন অ্যারোবিক ব্যায়াম করার সময় কয়েকটি শব্দের বেশি কথা বলতেও কষ্ট হবে।

টানা একইভাবে কাজের সময় কিছু ব্যবস্থা নেওয়া দরকার

আধ ঘণ্টা কাজের পর ৫ মিনিটের বিরতি নিয়ে একটু হাঁটা চলা করে আসুন, তাতে ওই ৫ মিনিটের বিরতির ক্ষতির চেয়ে মোটের উপর লাভই হয়। যাঁরা নিয়মিত গাড়ি চালান যদি সম্ভব হয় কিছুদুর গাড়ি চালানোর পর অল্প সময় করে (৫মিনিট) গাড়ি থেকে নেমে হাঁটাচলা করে আবার গাড়ি চালান। অন্য কেউ গাড়ি চালাতে জানলে চালক পরিবর্তন করে গাড়ি চালাতে পারেন।

ভারী জিনিস তোলার সঠিক পদ্ধতি

স্লিপ ডিস্ক বা মেরু চাকতি সরে যাওয়ার একটা বড়ো কারণ হল ভারী জিনিস তুলতে যাওয়া। সঠিক ভাবে ভারী জিনিস তুললে কিন্তু এর প্রকোপ অনেকটা কমানো যায়।

- সবার প্রথম কোথা থেকে কোথায় জিনিস নিয়ে যেতে চান ও তার পদ্ধতি সম্পর্কে আগে ঠিকমতো ভেবে নেওয়া জরুরি। তার পরই কাজে নামা শ্রেয়। হাতের কাছের কোনো জিনিস আপনার কাজের সাহায্যে আসতে পারে কিনা ভেবে দেখুন ও দরকার হলে ব্যবহার করুন।
- চপ্পল জাতীয় জুতো বা হিল তোলা জুতো পরে থাকলে তা খুলে, বাঁধা জুতো বা বুট ব্যবহার করা ভালো।
- খুব টাইট বা খুব ঢিলে জামা কাপড় ব্যবহার না করা দরকার।
- ভারী যে জিনিসটা নিচ্ছেন তার গায়ের মোড়ক থাকলে তা খুলে নিন। বয়ে নিয়ে যাওয়ার পথে কোনো বাধা থাকলে তা সরিয়ে দিন।
- ওজনটি কোমরের যথাসম্ভব কাছে রাখার চেষ্টা করুন। এতে ওজন তোলার সময় কোমরের ওপর চাপ কম পড়ে। ওজনের ভারী দিক শরীরের কাছের দিকে রাখুন।

➢ ওজন তোলার আগে দুই পায়ের মধ্যে পরিমাণমতো ফাঁকা থাকা জরুরি ও একটি পা সামান্য সামনের দিকে এগিয়ে রাখা দরকার। যদি ওজনটি মাটি থেকে তুলতে হয় সেক্ষেত্রে ওজনের কাছের পা-টি সামান্য সামনের দিকে এগিয়ে রাখতে হবে, যাতে ওজন তোলার সময় সামনের পায়ের সামান্য অবস্থান-পরিবর্তন করে ওজনসহ শরীরের ভারসাম্য সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

➢ হাঁটু, উরুসন্ধি ও শিরদাঁড়া সামনের দিকে সামান্য ভাঁজ করে ওজন তোলা দরকার। শিরদাঁড়া পাশের দিকে বা পেছনের দিকে বাঁকানো ক্ষতির কারণ হতে পারে। তাছাড়া সামনের দিকে বেশি ভাঁজ করাও বিপদের কারণ হতে পারে। হাঁটু ও উরুসন্ধি পুরো ভাঁজ করলে বা পায়খানা করার মতো করে বসলে কোমরের ওপর চাপ বেশি পড়ে।

➢ ওজনটি যাতে ভালোভাবে ধরা যায় ও শরীরের কাছাকাছি ধরা যায় তা নজর রাখা দরকার।

➢ ওজন তোলা ও হাঁটু এবং উরুসন্ধি সামান্য ভাঁজ থেকে সোজা করা—এই দুই একসঙ্গে হওয়া বাঞ্ছনীয়। ওজন আগে তুলে পরে হাঁটু ও উরুসন্ধি সোজা করলে ওজন তোলার অসুবিধে হবে। অন্যদিকে হাঁটু ও উরুসন্ধি আগে সোজা করলে ওজন তোলার সময় শিরদাঁড়া বেশি বাঁকাবে, ফলে চাপ বেশি পড়বে।

➢ মাটি থেকে ওজন তোলার সময় যদি ওজন বেশি হয় সেক্ষেত্রে প্রথমে চেয়ার বা টুল জাতীয় কিছুতে ওজনটিকে তুলে রেখে তারপর পুরোপুরি তোলা উচিত।

➢ ওজন তোলার সময় বা বয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় শিরদাঁড়া ও কোমরের পাশাপাশি মোচড় দেবেন না। দরকার হলে ওজন সহ পুরো শরীরের দিক পরিবর্তন করুন ধীরে ধীরে।

➢ ওজন তোলার পর সবসময় পথের দিকে তাকান, ওজনের দিকে নজর দেবেন না।

➢ আগে ওজন মাটিতে নামান তারপর সঠিক স্থানে রাখার চেষ্টা করুন।

➢ সর্বোপরি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল নিজের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সঠিক ধারণা রাখা।

চেয়ার টেবিল ও কম্পিউটারের কাজ করার সময় নীচের কয়েকটি বিষয়ের দিকে খেয়াল রাখা দরকার

☞ চেয়ারের পেছনের দিকে ঠেস দেওয়ার জায়গা থাকা দরকার যাতে কোমরের নীচের দিকে ঠিকভাবে ঠেস দেওয়া যায় ও এই ঠেস দেওয়ার জায়গার বক্রতা কোমরের বক্রতার পরিপূরক হয়।

☞ চেয়ারের উচ্চতা এমন হওয়া দরকার যাতে হাত ও পুরোবাহু টেবিলের ওপর মাটির সমান্তরালে থাকে।

☞ কাঁধ নমনীয়ভাবে রাখা দরকার ও কনুই শরীরের পাশ বরাবর থাকা দরকার যাতে বাহু ও পুরোবাহু কনুইতে 'L' আকৃতির সৃষ্টি করে।

☞ দুই থাই পুরোপুরি চেয়ারে থাকা দরকার।

☞ হাঁটু, উরুসন্ধির চেয়ে অল্প নীচে থাকবে। বসার পর হাঁটুর সন্ধিতে থাই ও পা যে কোন তৈরি করবে তা ৯০ থেকে ১১০ ডিগ্রির মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

☞ পায়ের পাতা মাটিতে পুরোপুরি লেগে থাকা দরকার। যাঁদের উচ্চতা কম তাঁরা পাদানি ব্যবহার করতে পারেন পায়ের পাতা রাখার জন্য। কিন্তু পাদানির উচ্চতা সঠিক হওয়া জরুরি। একটি পা অন্য পায়ের ওপর রাখবেন না, এতে সমস্যা বাড়ে।

☞ কম্পিউটারের কাজ করার সময় কম্পিউটারের পর্দা চোখের সোজাসুজি ও চোখ থেকে এমন দূরত্বে থাকবে যাতে বসে হাত সামনের দিকে সোজা মেলে ধরলে পর্দা আঙুলে স্পর্শ করে। পর্দার উপরের দিকটি চোখের সমান উচ্চতায় থাকা দরকার।

☞ কি বোর্ড হাতের নাগালের মধ্যে থাকা দরকার। টেবিলের সামনের দিক থেকে কমপক্ষে ছয় ইঞ্চি দূরে কি-বোর্ড রাখা দরকার যাতে ওই ফাঁকা অংশে হাত রাখতে সুবিধা হয়।

☞ কম্পিউটারের কাজের সময় ব্যবহার করা চেয়ারে পুরোবাহু রাখার জন্য হাতল (fore arm rest) থাকা জরুরি।

☞ মাউস, প্রিন্টার, টেলিফোন ইত্যাদি যা বেশি ব্যবহার করার দরকার পড়ে তা যথাসাধ্য কাছে রাখুন।

☞ যাঁদের কাজ করার সময় অনেকক্ষণ ফোনে কথা বলতে হয় তাঁরা ফোনের বদলে হেডফোন ব্যবহার করুন।

☞ নির্দিষ্ট সময় অন্তর ৫ মিনিট করে ঘুরে এসে আবার কাজে বসুন।

ব্যায়াম শুরু বা খেলাধুলোর আগে ওয়ার্ম আপ করা

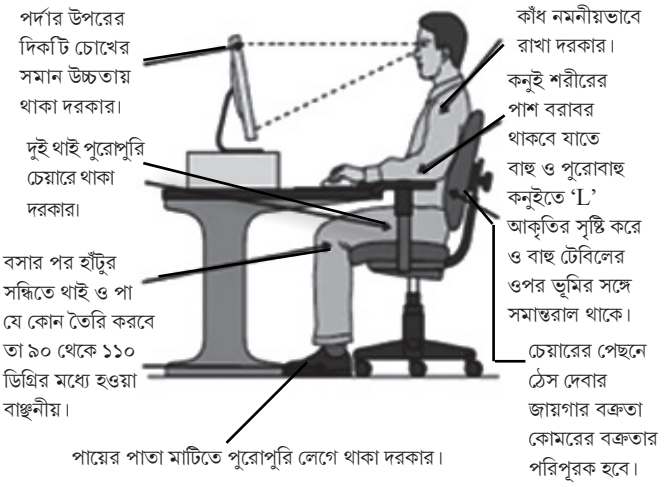

চিত্র ১.

ব্যায়াম বা খেলাধুলোর আগে অন্তত ৬ মিনিট ওয়ার্ম আপ করা প্রয়োজন। খেলাধুলোর আগে প্রয়োজন মনে হলে বেশি সময় ধরে ওয়ার্ম আপ করা যেতে পারে।

১. একটি নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়িয়ে মার্চ অন করা। পরে সামনের দিকে ও পেছনের দিকে মার্চ অন করা। প্রতিটি ১ মিনিট করে মোট ৩ মিনিট। মার্চ অন করার সময় পায়ের সঙ্গে বাহুর ছন্দপ্রবণ ওঠা-নামা জরুরি। কনুই অর্ধেকটা মোড়া থাকবে ও হাতের মুঠো হালকা থাকবে। হাঁটু উরু সন্ধি অবধি ওঠা-নামা করবে। (চিত্র ২)।

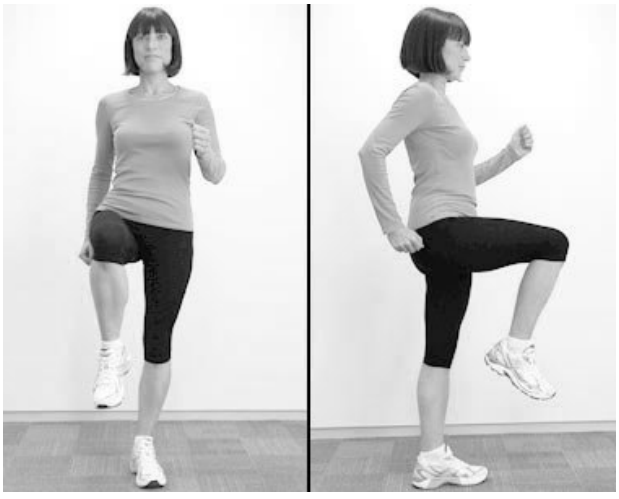

চিত্র ২.

২. পরিবর্তিতভাবে গোড়ালি সামনের দিকে করা। এক্ষেত্রে সামনের পায়ের আঙুল উপরের দিকে থাকবে। পেছনের পায়ের পাতা মাটির ওপর পুরোপুরি থাকবে ও পেছনের পায়ের হাঁটু সামান্য ভাঁজ হবে। হাত দু-টি কুস্তি করার অবস্থানে থাকবে। ১ মিনিট ধরে মোট ৬০ বার চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু অবশ্যই প্রথমে ধীরে ধীরে কম সংখ্যায় শুরু করা দরকার। কারণ দ্রুত করতে গিয়ে ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ও আঘাত পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। (চিত্র ৩)।

চিত্র ৩.

৩. সোজাভাবে কোমর সোজা করে দাঁড়িয়ে হাঁটু ভাঁজ করে উরুসন্ধির উচ্চতা পর্যন্ত তুলে বিপরীতের হাত দিয়ে হাঁটু ছুঁতে হবে এক পায়ে দাঁড়িয়ে। পর্যায়ক্রমে ৩০ সেকেন্ডে ৩০ বার। এটি করার সময় মনে রাখতে হবে শিরদাঁড়া সোজা রাখা ও পেটের মাংসপেশি যথাসম্ভব শক্ত রাখা জরুরি। এক্ষেত্রেও ধীরে ধীরে ও কম সংখ্যায় শুরু করা দরকার আঘাত এড়াতে। (চিত্র ৪)।

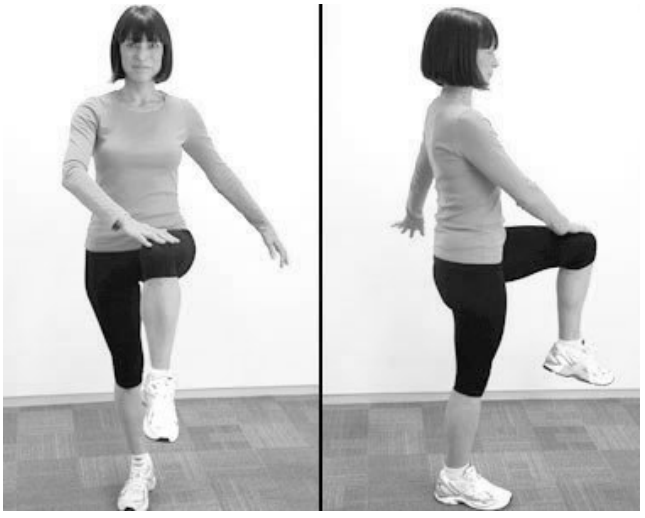

চিত্র ৪.

৪. সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বাহু ও হাত পুরোপুরি হালকাভাবে ঝুলিয়ে দিয়ে মার্চ করতে করতে কাঁধ অস্থিসন্ধিতে সামনের দিকে ও পেছনের দিকে সরানো ৫ বার করে। (চিত্র ৫)।

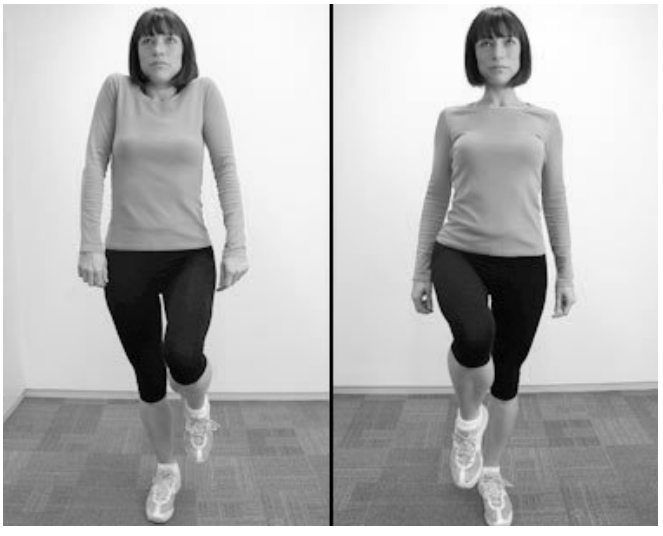

চিত্র ৫.

৫. সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হাত দুটো সামনের দিকে বাড়িয়ে রাখা অবস্থায় হাঁটু সামান্য মুড়ে ঝুঁকে থাকা অল্পক্ষণ। তারপর আবার সোজা হওয়া। ১০ বার করা। মনে রাখতে হবে এই ঝুঁকে থাকা ৫ থেকে ১০ সেন্টিমিটারের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়। (চিত্র ৬)।

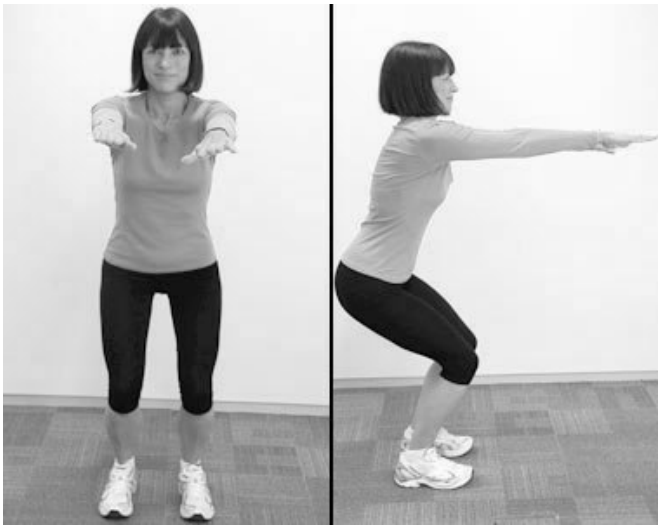

চিত্র ৬.

কোমর ও পা বরাবর নামা ব্যথার ব্যায়াম

কোমর ও পা বরাবর নামা ব্যথার ক্ষেত্রে এই ব্যায়ামগুলির খুব গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা থাকে। সপ্তাহে অন্তত ৫ দিন এক বেলা ৩০ মিনিট করে এই ব্যায়ামগুলি পর্যায়ক্রমে করা জরুরি।

১. সোজাভাবে শুয়ে শরীর পুরোপুরি হালকা ছেড়ে দেওয়া, তারপর ধীরে ধীরে গভীর প্রশ্বাস নেওয়া ও তারপর ধীরে ধীরে নিশ্বাস ছেড়ে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরা, ১০ বার। (চিত্র ৭)।

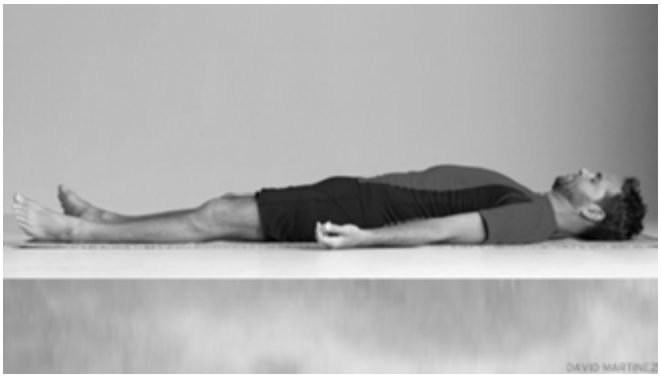

চিত্র ৭.

২. প্রথমে সোজাভাবে শুয়ে তারপর ডান হাঁটু ভাঁজ করুন। এরপর দু-হাত দিয়ে হাঁটু ধরে বুকের দিকে টেনে ধরুন ও ঘাড় সামনের দিকে ভাঁজ করুন। এই অবস্থায় ১০ পর্যন্ত গুনুন। এরপর ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসে আবার বাম পায়ে করুন। মোট ১০ বার করে। (চিত্র ৮)।

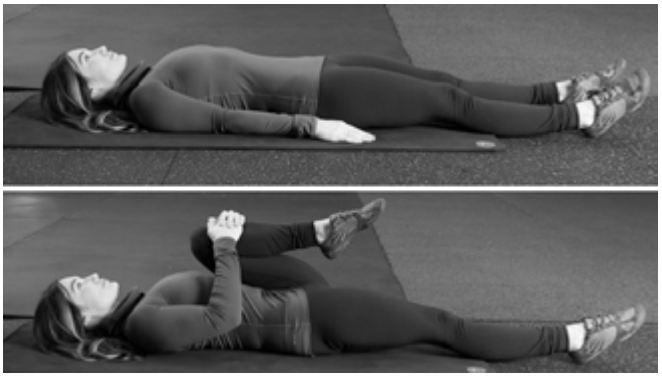

চিত্র ৮.

৩. এরপর সোজা হয়ে শুয়ে দুই হাত দিয়ে দুই হাঁটু ভাঁজ করে বুকের দিকে টেনে ধরুন ও ঘাড় সামনের দিকে ভাঁজ করুন। ওই অবস্থায় ১০ পর্যন্ত গুনুন ও তারপর ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসুন। মোট ১০ বার। (চিত্র ৯)।

চিত্র ৯.

৪. সোজা হয়ে শুয়ে শরীরের উপরের ভাগ উপরের দিকে কিছুটা তুলুন ও হাত দুটো পায়ের দিকে নির্দেশ করে তুলে ধরে রাখুন ও ১০ পর্যন্ত গুনুন। তারপর স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসুন। মোট ১০ বার। (চিত্র ১০)।

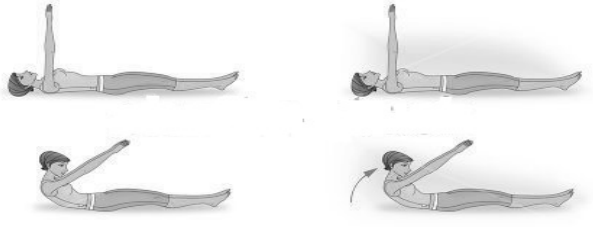

চিত্র ১০.

৫. সোজা হয়ে শুয়ে দুই পা একসঙ্গে তুলে ধরে রাখুন ও ১০ পর্যন্ত গুনুন। নজর রাখতে হবে যাতে পা দু-টি মেঝের সঙ্গে মোটামুটি ৩০ ডিগ্রি কোণ করে থাকে। তারপর স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসুন। মোট ১০ বার। যদি দুই পা একসঙ্গে করতে অসুবিধে হয় সেক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে একটি পা করে করতে পারেন। কিন্তু অবশ্যই চেষ্টা থাকবে যাতে দুই পায়ের একসঙ্গে করা যায়। (চিত্র ১১)।

চিত্র ১১.

৬. সোজা হয়ে শুয়ে দুই পা ও শরীরের উপরের ভাগ উপরের দিকে একসঙ্গে তুলে ধরে রাখা। এক্ষেত্রে হাত দুটো পায়ের দিকে নির্দেশ করে থাকবে। শরীরের আকৃতি অনেকটা নৌকোর মতো দেখতে লাগবে। এই অবস্থায় ১ থেকে ১০ পর্যন্ত গুনুন। তারপর স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসুন। মোট ১০ বার। (চিত্র ১২)।

চিত্র ১২.

৭. সোজা হয়ে শুয়ে দুই হাঁটু ভাঁজ করে নিন। লক্ষ রাখুন যাতে হাঁটু দু-টি পাশাপাশি লেগে থাকে। এরপর ধীরে ধীরে হাঁটু দুটো একে অপরের গায়ে লাগানো অবস্থায় ডান দিকে নামাতে থাকুন যতক্ষণ না মাটিতে লাগে। ১ থেকে ১০ পর্যন্ত গুনুন। তারপর ধীরে ধীরে আগের অবস্থায় ফিরে এসে উলটো দিকে করুন। মোট ১০ বার। (চিত্র ১৩)।

চিত্র ১৩.

ব্যায়াম বা খেলাধুলোর পর স্ট্রেচিং ব্যায়াম

ব্যায়াম বা খেলাধুলোর পর ধীরে ধীরে এই স্ট্রেচিং ব্যায়ামগুলি করা দরকার ৫ মিনিট ধরে। এতে শরীর ধীরে ধীরে শান্ত হওয়ার পাশাপাশি আমাদের ফ্লেক্সিবিলিটি বা স্থিতিস্থাপকতা বাড়ে।

১. প্রথমে ডান পা অন্য দিকে ভাঁজ করে বাম থাইয়ের ওপর রাখুন। তারপর ধীরে ধীরে বাম হাঁটু ভাঁজ করুন। দু-হাত দিয়ে বাম থাইয়ের পেছনের দিক ধরে বুক অবধি টানুন। যতটা টানলে কষ্ট না হয়। এরপর উলটো দিকেরটা করুন। (চিত্র ১৪)।

চিত্র ১৪.

২. প্রথমে মেঝেতে সোজা হয়ে শুয়ে পড়ুন। বাম পা হাঁটু ভাঁজ করুন। পায়ের পাতা যেন মেঝেতে লেগে থাকে। এরপর ডান পায়ে হাঁটু না মুড়ে সোজাভাবে তুলতে থাকুন ও দু-হাত দিয়ে ডান পায়ের থাইয়ের পেছনের দিক ধরে রাখুন ১০ সেকেন্ড। এরপর উলটো পায়ের ক্ষেত্রে একইভাবে করুন। (চিত্র ১৫)।

চিত্র ১৫.

৩. কোমর সোজা করে বসুন। হাঁটু পাশের দিকে ভাঁজ করে বসুন যাতে দু পায়ের পাতা একে অপরের সঙ্গে লেগে থাকে। হাত দিয়ে পায়ের দুই পাতা ধরে রেখে ধীরে ধীরে হাঁটু মাটিতে ঠেকানোর চেষ্টা করুন। যতটা দূর পর্যন্ত করতে পারেন সেই অবস্থায় পৌঁছে ১০

সেকেন্ড ধরে রেখে আবার ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসুন। (চিত্র ১৬)।

চিত্র ১৬.

৪. সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ডান পা সামান্য সামনের দিকে এগিয়ে সামান্য ভাঁজ অবস্থায় রাখুন এবং সামান্য সামনের দিকে ঝুঁকে থাকুন। এরপর বাম পা সোজা করে বাম পায়ের গোড়ালি মাটিতে ঠেকান ও ১০ সেকেন্ড এই অবস্থায় থাকুন। ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসে উলটো পায়ের ক্ষেত্রে একইভাবে করুন। (চিত্র ১৭)।

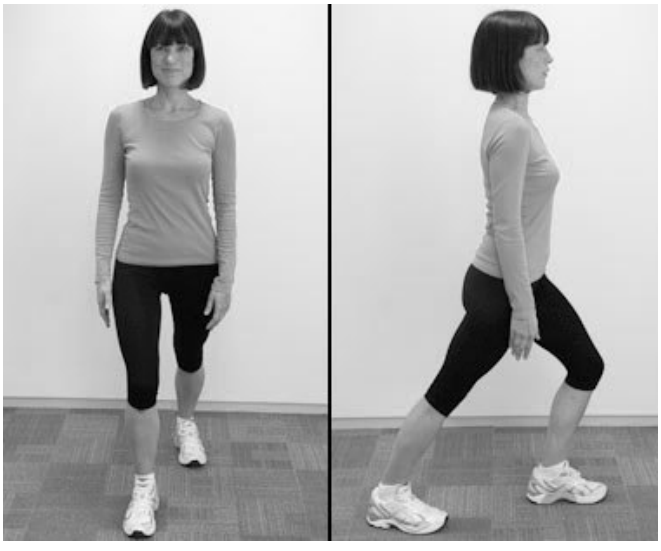

চিত্র ১৭.

৫. ডান দিকে পাশ ফিরে সোজা হয়ে ঘুমান। বাম পায়ের পাতার সামনের দিক বাম হাত দিয়ে ধরুন ও বাম গোড়ালি পেছনের দিকে টেনে বাম দিকের পাছায় ঠেকান ও ১০ সেকেন্ড ধরে রাখুন। অবশ্যই দুই হাঁটু যেন একে অপরের সঙ্গে লেগে থাকে ও উরুসন্ধিতে ভাঁজ না হয়। ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসুন। এরপর পাশে ঘুরে শুয়ে উলটো পায়ের ক্ষেত্রে করুন। (চিত্র ১৮)।

চিত্র ১৮.

সঠিকভাবে ব্যাগ নেওয়ার পদ্ধতি

কাঁধে নেওয়ার ব্যাগ সবসময় দুই দিকের কাঁধে নেওয়া উচিত ও ব্যাগ যাতে পিঠের সঙ্গে লেগে থাকে তার দিকে লক্ষ থাকা উচিত। অনেকেই ব্যাগ এমনভাবে নেন যাতে অনেকটা নীচে, অনেক সময় কোমরের কাছে ঝুলে থাকে বস্তার মতো, তা একেবারেই অনুচিত। খেয়াল রাখতে হবে জিনিসপত্র ব্যাগে সাজানোর সময় যেন এমনভাবে সাজানো থাকে যাতে অপেক্ষাকৃত ভারী ওজনের জিনিসপত্র পিঠের কাছাকাছি থাকে ব্যাগ কাঁধে নেওয়ার পর। যাঁরা খুব বড়ো ব্যাগ ব্যবহার করেন বা ট্রেকিং করেন, তাঁরা ব্যাগ গোছানো ও নেওয়ার সঠিক পদ্ধতি এবং কোথায় ব্যাগের বেল্ট বাঁধা উচিত তা নিয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছে পরামর্শ নিন।

কয়েকটি মনে রাখার বিষয়

- সব সময় মনে রাখবেন ব্যক্তি বিশেষ ও তার রোগের ওপর ভিত্তি করে ব্যায়ামের ধরনের তারতম্য ঘটে। নির্দিষ্ট মাংসপেশিভিত্তিকও কিছু কিছু ব্যায়াম আছে। তাই চিকিৎসক ও ফিজিয়োথেরাপিস্টের মতামত নিন ও প্রথমের দিকে ফিজিয়োথেরাপিস্টের তত্ত্বাবধানে ব্যায়াম করুন।
- কোনো ব্যায়াম করতে অসুবিধা হলে (শারীরিকভাবে) জোর করে ব্যায়াম করবেন না। এতে ক্ষতির সম্ভাবনা বেশি। ডাক্তার বা ফিজিয়োথেরাপিস্টের পরামর্শ নিন।
- ব্যায়াম করতে করতে হঠাৎ করে খ্যাঁচকা লাগলে বা হঠাৎ করে ব্যথা খুব বাড়লে, ব্যায়াম বন্ধ করে আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
- আপনার যদি হার্টের রোগ থাকে তাহলে ব্যায়াম করার আগে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে তবেই শুরু করুন। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. মৃন্ময়, এমবিবিএস, শ্রমজীবী মানুষদের জন্য তৈরি এক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সবসময়ের ডাক্তার।

মদ থেকে লিভার খারাপ

মদ খেলে লিভার খারাপ হয় সবাই জানি। কিন্তু কী খারাপ হয়, কেন হয়—জানিয়েছেন **ডা. দীপংকর জানা,** NHS-এর রোগীদের জন্য প্রচার সামগ্রীর সহায়তায়।

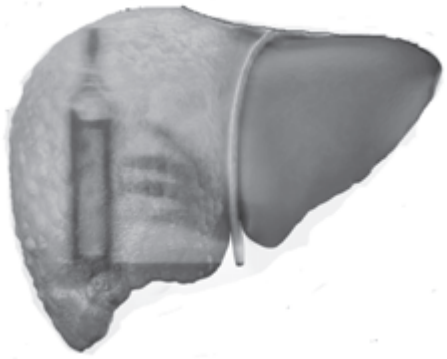

দুর্গা পুজোর ভাসানই হোক, পাড়ার কালীপূজাই হোক নতুবা বছরের শেষ—হাসপাতালের ইমারজেন্সিতে ডাক্তারবাবুদের প্রতি আবেদন-নিবেদন যেন কেমন বেড়েই ওঠে। শুরুটা খুব আকস্মিক ভাবে—'ডাক্তারবাবু, . . . খুব ইমারজেন্সি, একটু তাড়াতাড়ি আসবেন।' ভিড়ে ঠাসা ইমারজেন্সিতে আগের রোগীর হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে দৌড়ে গিয়ে দেখি ইমারজেন্সি রোগী হয়তো নিজেকে সংকুচিত করে পেটের উপরে হাত দুটোকে নিয়ে বিছানায় পাক খাচ্ছে, কিংবা বমি করে বিছানা ভাসিয়ে দিয়েছে। মাথায় একটাই প্রশ্ন আসে কী হয়েছে? বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই রোগী বলে ওঠেন 'আর করব না, এই বারের মতো আমাকে সারিয়ে তুলুন।' রোগীর বাড়ির লোক কিন্তু খানিকটা গালমন্দ করছেন, কেউ-বা খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে কিছুটা লজ্জায় নিজের বাকরোধ করে নিয়েছেন, কেউ আবার এক নিশ্বাসে যা হয়েছে বলে গেছেন। বুঝতে কিছুই অসুবিধে হয়নি এখান থেকেই যাত্রা শুরু, শেষটা হয়তো ক্ষীণকায় পেট ফোলা টকটকে হলদে, রোগীর মুখ দিয়ে রক্তপাত নতুবা অজ্ঞানতায়। উচ্চস্বরে হাত-পা ছড়িয়ে চিৎকার চেঁচামেচি করা। এতদূর শুনে মনে হয় খানিকটা পাঠকরাও বুঝতে পারছেন আমি মদ্যপ রোগী বা অ্যালকোহলজনিত লিভারের রোগ (Alcohol Related Liver Disease—ARLD) হওয়া রোগীর কথাই বলছি। এই আলোচনাটা আর একটু বিস্তারিতভাবে করলেই শুরু আর শেষের মিলটা বুঝতে পারবেন।

লিভার এবং অ্যালকোহল

লিভার বা যকৃৎ আমাদের শরীরের একটা জটিল অঙ্গ, যা শরীরের মধ্যে মিশে থাকা দূষিত পদার্থ রক্ত থেকে শোষণ করে তা নষ্ট করে। খাদ্য পাচনের বিভিন্ন পদার্থ পাচনের সময় নিষ্কাশন করে। শরীরের মধ্যে ও রক্তে চর্বির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে। শরীরের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলে বিভিন্ন অণুজীব বা পরজীবদের সঙ্গে শরীরকে যুদ্ধ করতে সাহায্য করে। রক্ত তঞ্চনের (জমাট বাঁধার) বিভিন্ন পদার্থ যকৃৎ তৈরি করে। যদি কোনোভাবে যকৃৎ কোষ নষ্ট হয়ে যায় তাহলে সাধারণত যকৃৎ কোষ নতুন কোষ তৈরি করতে পারে। প্রত্যেকবার অ্যালকোহল পান করার পরে, কিছু পরিমাণ যকৃৎ কোষ নষ্ট হয়ে যায়, সেই কোষ নিজে থেকেই যকৃৎ আবার তৈরি করে। কিন্তু যকৃৎ-এর এই ক্ষমতা কমতে থাকে, যদি দীর্ঘদিন ধরে অ্যালকোহল পান করা হয় তখন যকৃৎ কোষ পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায়।

কী কী কারণে অ্যালকোহলজনিত লিভারের রোগ হয়?

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অ্যালকোহলজনিত লিভারের রোগ হয় মাত্রাতিরিক্ত দীর্ঘ বা অল্প সময়ের জন্যও অ্যালকোহল পান করলে। পুরুষ ও মহিলাদের জন্য এর সর্বোচ্চ মাত্রা ১৪ ইউনিট প্রতি সপ্তাহে। [১ ইউনিট=১/২ PIAT/ ২৫ মিলিলিটার এক-শো শতাংশ অ্যালকোহল]। এছাড়া যে কারণগুলি অ্যালকোহলজনিত লিভারের রোগ হতে সাহায্য করে সেগুলি হল অতিরিক্ত মোটা থাকা, মহিলার আগে থেকেই যদি যকৃৎ-এর কোনো প্রদাহ থাকে, এবং বংশগত কোনো যকৃৎ রোগের সমস্যা।

অ্যালকোহলজনিত লিভারের রোগের কী কী উপসর্গ?

উপসর্গগুলির কিছু যকৃৎ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার প্রথমের দিকে দেখা যায়

যেমন—পেটে ব্যথা, খেতে অনীহা, অসুস্থতা বোধ করা, পাতলা পায়খানা, বমি করা। আর চামড়া ও চোখ হলুদ হয়ে যাওয়া, পেট এবং পা ফুলে যাওয়া, কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসা, সারা শরীরে চুলকানি হওয়া, চুল পড়ে যাওয়া, ওজন কমে যাওয়া, দুর্বলতা, ঘুম কমে যাওয়া, স্মৃতিশক্তি হ্রাস পাওয়া, বিভ্রান্ত হওয়া, রক্তবমি, মলদ্বার দিয়ে রক্ত পড়া, নাক ও ঠোঁট দিয়ে রক্ত পড়া—এগুলি সবই অতিরিক্ত যকৃৎ কোষ নষ্ট হয়ে যাওয়ার জন্য দেখা যায়।

অ্যালকোহলজনিত লিভারের রোগের বিভিন্ন পর্যায়

১. অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ় (Alcoholic Fatty Liver Disease)

এরকম ক্ষেত্রে অল্পদিনও বেশি পরিমাণ অ্যালকোহল পান করার জন্য, যকৃৎ কোষে চর্বি জমে যায়। এরকম ক্ষেত্রে রোগীর প্রাথমিক উপসর্গগুলি দেখা যেতেও পারে আবার নাও পারে। এক্ষেত্রে যকৃৎ কোষগুলি মদ্যপান বন্ধ রাখলে নিজে থেকেই নতুন কোষ তৈরি করতে পারে।

২. অ্যালকোহলিক হেপাটাইটিস (Alcoholic Hepatitis)

এ ক্ষেত্রে যকৃৎ-এর প্রদাহ শুরু হয়, যাতে করে অনেক বেশি পরিমাণ যকৃৎ কোষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এক্ষেত্রে যকৃৎ নিজে থেকে নতুন কোষ তৈরি করতে পারে, যদি পরবর্তী সময়ের জন্যও পুরোপুরি অ্যালকোহল পান বন্ধ রাখা হয়।

৩. সিরোসিস (Cirrhosis)

এতে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ যকৃৎ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যকৃৎ কোষ দীর্ঘস্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যদি পরবর্তী সময়ের জন্য পুরোপুরি মদ্যপান বন্ধ করা যায় তাহলে নতুন করে যকৃৎ কোষ নষ্ট হওয়া বন্ধ করা যায়। এরকম রোগী যদি মদ্যপান বন্ধ না করেন, তাহলে সমীক্ষা অনুযায়ী তাঁর ৫০%-এর কম সুযোগ থাকে ৫ বছর পর্যন্ত জীবিত থাকা।

অ্যালকোহলজনিত লিভারের রোগের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ে যকৃৎ-এর কোষের ক্ষতি ছাড়াও রোগী আরও অনেক ক্ষতিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হন। প্রথমত, পোর্টাল শিরা (Portal Vein)-এর উচ্চরক্তচাপ এবং শিরা ফুলে ওঠা (Varices)। এরকম ক্ষেত্রে যকৃৎ কোষের মধ্যকার রক্ত বের করতে না পারার জন্যও পরিপাক তন্ত্রের শিরা ও ধমনি ফুলে যায়, যাতে করে হৃৎপিণ্ডে রক্ত ঠিকভাবে পৌঁছাতে পারে। এই নতুন ধরনের তৈরি শিরা ও ধমনিকে Varices বলে। অনেক ক্ষেত্রে এই রকম Varices-গুলোতে রক্তচাপ এতটাই বেড়ে যায় যে রক্তকে ধরে রাখতে পারে না, সে ক্ষেত্রে এগুলি ছিঁড়ে যায় এবং মুখ দিয়ে রক্তপাত বা মলদ্বার দিয়ে রক্তক্ষরণ হয়। রোগী খুব অল্প সময়ের মধ্যে ভয়ংকরভাবে রক্তাল্পতায় ভোগা শুরু করেন।

দ্বিতীয়ত পেটে জল জমা বা ascites—এক্ষেত্রে portal vein-এর উচ্চরক্তচাপ ও শরীরে প্রোটিনের অভাবজনিত কারণে পেটে জল জমা শুরু হয়। অনেক সময় এই জলে অণুজীব প্রবেশ করলে আর এক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, যাকে spontaneous bacterial peritonitis বা আপনা থেকে হওয়া ব্যাকটিরিয়াজনিত পেরিটোনিয়ামের প্রদাহ বলে।

তৃতীয়ত লিভারের কারণে মস্তিষ্কের রোগ (hepatic encephalopathy)—এক্ষেত্রে যকৃৎ কোষ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার জন্য শরীরের মধ্যকার রক্তে দুষিত পদার্থের পরিমাণ অনেক বেড়ে যায়, যা মস্তিষ্কে প্রবেশ করে সমস্যা তৈরি করে—রোগীর উত্তেজিত হয়ে যাওয়া, হতভম্ব হয়ে যাওয়া, বিচলিত হওয়া, পেশি শক্ত হয়ে যাওয়া, পেশির কম্পন, কথা বলতে অসুবিধা হওয়া ইত্যাদি দেখা যায়। অনেক রোগী coma-তে পর্যন্ত চলে যেতে পারেন।

যকৃৎ-এর ক্ষমতা কমতে থাকে, যদি দীর্ঘদিন ধরে অ্যালকোহল পান করা হয় তখন যকৃৎ কোষ পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায়।

আবার ৩-৫% সিরোসিস রোগীর যকৃৎ-এর ক্যান্সার পর্যন্ত হয়। এরকম ক্ষেত্রে রোগীকে সারিয়ে তোলা তো দূরের কথা বাঁচিয়ে রাখাটাই দুষ্কর হয়ে ওঠে।

রোগী বা রোগীর বাড়ির লোক কীভাবে বুঝবেন রোগীর অ্যালকোহল নির্ভরতা তৈরি হয়েছে?

- ☞ রোগী কি মদ্যপান ছেড়ে দেওয়ার কথা ভাবেন?
- ☞ মদ ছাড়া নিয়ে কেউ বললে রোগী কি রেগে যান?
- ☞ মদ্যপান করা নিয়ে কি রোগীর মধ্যে অনুতাপ কাজ করে?
- ☞ সকালে ঘুম থেকে ওঠার পরে কখনো কি প্রথমে মদ পান করার কথা মনে পড়ে?

এগুলির মধ্যে কোনো এক বা একাধিক প্রশ্নের উত্তর যদি হ্যাঁ হয়, তা হলে বুঝতে হবে রোগীর অ্যালকোহল নির্ভরতা তৈরি হয়েছে।

রোগ-নির্ণয়: যকৃৎ-এর ক্ষতির পরিমাণ বোঝা

রোগী ডাক্তারের কাছে পৌঁছানোর পর, ডাক্তার কতগুলি পরীক্ষার মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করেন অ্যালকোহলজনিত লিভারের রোগ কোন পর্যায়ে আছে। প্রথমে যকৃৎ-এর কার্যক্ষমতার পরীক্ষা (Liver functional test)। যদি উপসর্গ ও LFT দেখে যথেষ্ট পরিমাণ যকৃৎ কোষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে মনে হয়, পরবর্তী পরীক্ষা হিসাবে পেটের আল্ট্রাসোনোগ্রাফি, সিটি স্ক্যান, এমআরআই স্ক্যান—এগুলি করা হয়। এগুলির পরেও যদি যকৃৎ কোষের নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর্যায় না জানা যায়, সেরকম ক্ষেত্রে একটি সরু সুচের মতো যন্ত্র দিয়ে যকৃৎ থেকে কোষ বের করে তা অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়, যাকে liver biopsy বলে। এছাড়া খাদ্যনালীর মধ্যে এক ধরনের নল ঢুকিয়ে গ্রাসনালী ও পাকস্থলীর সংযোগ স্থলের শিরা ফুলে আছে কিনা দেখা যায়। একে endoscopy বলে।

কীভাবে রোগীকে সুস্থ করে তোলা যায়?

প্রথমত মদ্যপান বন্ধ করা। একে ডাক্তারি ভাষায় abstinence বলা হয়। অ্যালকোহলজনিত লিভারের রোগের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের জন্যও সারা জীবনের মতো abstinence-এর প্রয়োজন হয়। তবে এই সময়ে যে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তাকে withdrawl syndrome বলে। এক্ষেত্রে রোগীর ঘুম কম হওয়া, হাত পা কাঁপা, চিন্তাশক্তি কমে যাওয়া, হিংস্র হয়ে যাওয়া ইত্যাদি ঘটে থাকে। প্রথম ৪৮ ঘণ্টা এরকম সমস্যা সবচেয়ে বেশি হয়, ধীরে ধীরে এগুলি কমে যায়। এরকম ক্ষেত্রে দরকার পড়লে রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করে ডাক্তার ও নার্সের পর্যবেক্ষণে রেখে ওষুধ ও মানসিক চিকিৎসার মাধ্যমে সাধারণ অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায়। রোগী পুরোপুরি সুস্থ হয়ে গেলে পরবর্তীকালের জন্যও মানসিক চিকিৎসার মাধ্যমে মদ্যপান করার চিন্তাভাবনাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করা হয়। এতে কাজ না করলে ওষুধ হিসাবে acamprosate, naltrixone, disulfiram দেওয়া হয়।

অ্যালকোহলজনিত লিভারের রোগের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের চিকিৎসার জন্যও রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করে প্রথমে খাদ্যাভ্যাস ও পুষ্টি নিয়ন্ত্রণ করা হয়—নুনের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা হয়, সারাদিনে কতটা জল খাবেন তার পরিমাণ নির্দিষ্ট করা হয়, এবং diuretics (মূত্রবর্ধক ওষুধ) দেওয়া হয় যাতে করে পেট ও পা ফোলা কমে। এরকম রোগীর শরীরে সঞ্চিত শর্করার পরিমাণ কমে যাওয়ার জন্যও পেশি দুর্বল হয় ও ক্ষয় হয়ে যায়, তা বাইরে থেকে যথেষ্ট পরিমাণে শর্করা ও প্রোটিন জাতীয় খাবার খাওয়ানোর মাধ্যমে পূরণ করা হয়। তাছাড়া উপসর্গ অনুযায়ী চিকিৎসা করা হয়। কিছু ওষুধ দেওয়া হয় যকৃৎ-এর প্রদাহ কমানোর জন্য, তবে এই ওষুধগুলির কার্যকারিতা নিয়ে যথেষ্ট প্রমাণের অভাব আছে। এসব কিছুর মাধ্যমে যদি রোগীকে সুস্থ করে তোলা না যায়, তখন সম্ভব হলে যকৃৎ প্রতিস্থাপন (liver transplant) করা যেতে পারে।

সর্বোপরি রোগীর মদ্যপান না করার চেষ্টার মাধ্যমে জীবনযাত্রার পরিবর্তনের ইচ্ছাই রোগীকে পুরোপুরি সুস্থ করে তুলতে পারে, যতক্ষণ পর্যন্ত যকৃৎ কোষ নিজে থেকে নতুন কোষ তৈরি করার ক্ষমতা রাখে।

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. দীপংকর জানা, এমবিবিএস, একটি সরকারি হাসপাতালে কর্মরত।

Advt.

এখন **দুর্বার ভাবনা** পাওয়া যাচ্ছে

শিলিগুড়িতে বুকস, কুচবিহারে পার্থ লাহিড়ী, এন এইচ রোড, নবদ্বীপের পোড়ামাতলায় সুজয়া প্রকাশনী, পশ্চিম মেদিনীপুরের ভূর্জপত্র (বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটি রোড), শান্তিনিকেতনে সুবর্ণরেখা।

কলকাতায়

হাওড়া স্টেশন (কলকাতা বাসস্ট্যান্ড, হাওড়া বাসস্ট্যান্ড), শিয়ালদহ স্টেশন (সানশাইন বুকস্টল, রামকৃষ্ণ পুস্তকালয় ও অন্যত্র), কলেজ স্ট্রিট (পাতিরাম, বুক মার্ক, মনীষা গ্রন্থালয়, বই-চিত্র ও অন্যত্র)।

রাসবিহারী মোড়, ফুলবাগান (বেলেঘাটা), হাতিবাগান, শ্যামবাজার (পাঁচমাথার মোড়), ঢাকুরিয়া (দক্ষিণাপণের বিপরীতে), বইকল্প (দোতলায়),

বিধাননগর (উল্টোডাঙা) স্টেশন ও অন্যত্র।

যাঁরা পত্রিকার এজেন্সি নিতে চান এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন-১২/৫ নীলমণি মিত্র স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৬।

কানের পর্দায় ফুটো

ডা. অপূর্ব

স্বাস্থ্যের বৃত্তে পত্রিকার একনিষ্ঠ সম্পাদকের উদগ্রীব তাড়নায় কানের পর্দা যখন ফেটে যাওয়ার উপক্রম তখন লিখতে বাধ্য হলাম কানের পর্দায় ফুটো নিয়ে। এমনিতেই দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ, তাতে আবার কালা হয়ে যাওয়াটা সমীচীন বোধ হল না।

একটা গল্প বলি। রবীন্দ্রনাথের দাদা সত্যেন্দ্রনাথকে তার বাবা ডাকতেন "হা-কালা" বলে। যদিও কালা ছিলেন না সত্যেন্দ্রনাথ, খুব অন্যমনস্ক আর ভাবুক প্রকৃতির ছিলেন। মেডিক্যাল কলেজের কানের ডাক্তার দেখে বললেন এ ছেলে কালা নয় (তখনকার সময় কলকাতার উচ্চবিত্তরাও মেডিক্যাল কলেজে ইংরাজ ডাক্তার দেখাতে যেতে ভয় পেতেন)। তাতেও বাবা সন্তুষ্ট হলেন না ও তারপর অনেকদিন ধরে মাসে মাসে নাপিত ডেকে কানে তেল ঢেলে, কান খুঁচিয়ে, পিচকারি দিয়ে কান পরিষ্কার করিয়ে ছেলেকে ও নিজেকে ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছিলেন। যাই হোক। কালা হওয়ার একটা কারণ কানের পর্দায় ফুটো বটে। কিন্তু কানে কম শোনার আরও অনেক কারণ আছে। যেদেশের ওয়েবসাইট থেকে এই লেখার মূল বিষয়বস্তু নেওয়া সেই ব্রিটেনে কিন্তু কানের পর্দায় ফুটো বিশাল কিছু সিরিয়াস ব্যাপার নয়। কিন্তু আমাদের দেশে "কানে খাটো পণ্ডিত মশাই সকাল সকাল দুই কানের গহ্বরে ও নাভিতে এক এক পো সরিষার তৈল উত্তমরূপে ঢালিয়া পানা পুকুরে গিয়া ডুব দিলেন" বলে কানের পর্দায় ফুটো দিয়ে পানা ও আরও যে কত কত আঁকা বাঁকা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণুজীব তাঁর মধ্যকর্ণের ভেতর চলিয়া গিয়া কঠিন 'ইনফেকশন' বাধাইয়া তুলিল তাহা স্বয়ং ভগবানেরও জানার কথা নয়। সেই জন্যেই আমাদের দেশে কানে ফুটো রোগটার একটা আলাদা গুরুত্ব আছে।

কানের পর্দায় ফুটো নিয়ে বলার আগে কানের গঠন সহজ করে একটুখানি জেনে নেওয়া প্রয়োজন। তাতে বোঝার সুবিধা হবে। কানে তিনটি করে প্রকোষ্ঠ থাকে। বাইরে থাকে বাইরের কান বা বহিঃকর্ণ, মাঝে মধ্যকর্ণ আর তার ভেতরে অন্তঃকর্ণ। বহিঃকর্ণ শব্দকে ঠেলে মধ্যকর্ণের দিকে পাঠিয়ে দেয়। বহিঃকর্ণ আর মধ্যকর্ণের মাঝে থাকে আমাদের এ গল্পের কানের পর্দা। মধ্যকর্ণে তিনটি ছোটো ছোটো হাড় থাকে যারা শব্দ-বিবর্ধক বা amplifier হিসেবে কাজ করে। অন্তঃকর্ণের গঠন সবচেয়ে জটিল, সেখানে শব্দশক্তি চুলের মতো দেখতে একধরনের কোষের মধ্যে উদ্দীপনা তৈরি করে যা স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে যায়। মধ্যকর্ণ থেকে মুখগহ্বরের পেছনের দিক পর্যন্ত একটি নালী বিস্তৃত থাকে। একে ইউস্টেচিয়ান নালী বলে। এই নালী দিয়ে শ্বাসনালীর উপরের দিককার সংক্রমণ মধ্যকর্ণে চলে যেতে পারে ।

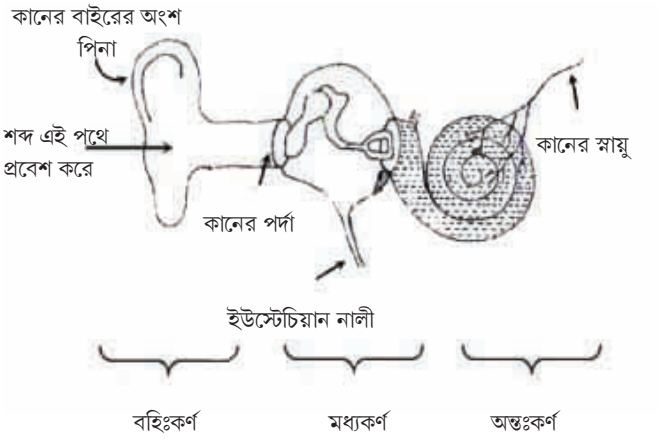

চিত্র ১. কানের গঠন

সাধারণত কানের পর্দায় ফুটো কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আপনা থেকেই সেরে যায়। কিন্তু একইসঙ্গে মধ্যকর্ণের সংক্রমণ হয়ে থাকলে কিন্তু নিজে থেকে ফুটো নাও জুড়তে পারে। তাই ডাক্তার দেখিয়ে নেওয়া জরুরি।

কী কী কারণে কানের পর্দায় ফুটো হতে পারে?

১. কানে, বিশেষ করে মধ্যকর্ণের সংক্রমণ (আমাদের দেশে এটি একটি অন্যতম কারণ)।

২. কোনো আঘাতের ফলে, সেটা কানের বাইরে বিরাশি সিক্কার চড় খেলেও হতে পারে, আবার কানখুঁচুনি (ear bud) দিয়ে কান পরিষ্কার করতে গিয়ে কানের বেশি ভেতরে খুঁচিয়ে ফেললেও হতে পারে।

৩. এরোপ্লেনে ওড়ার সময় বায়ুচাপের তারতম্যের কারণে। একই সমস্যা যারা scuba diving জাতীয় কাজ করেন তাদের হতে পারে। আমাদের দেশে অবশ্য ক-জনই বা scuba diving করে!

৪. হঠাৎ করে তীব্র আওয়াজ হলে কানের পর্দা ফেটে যেতে পারে। যেমন বিস্ফোরণের শব্দে।

৫. বাচ্চাদের ক্ষেত্রে গলার ভেতর অ্যাডিনয়েড টনসিল (adenoid tonsil) বলে একধরনের গ্রন্থি থাকে যার সংক্রমণ হলে গ্রন্থিটি ফুলে উঠে ইউস্টেচিয়ান নালীকে বন্ধ করে দেয়, তার জন্যেও মধ্যকর্ণের সংক্রমণ হতে পারে। বাচ্চাদের উপরের তালু চেরা থাকলে (Cleft Palate) বা বাচ্চার ডাউন সিন্ড্রোম (Down Syndrome) থাকলে বারবার মধ্যকর্ণের সংক্রমণ হতে পারে।

কানের পর্দায় ফুটো হলে কী কী উপসর্গ দেখা যাবে?

১. হঠাৎ করে কানে কম শোনা, বা একেবারেই শুনতে না পাওয়া।
২. কানে ব্যথা।
৩. কান থেকে রস বা পুঁজ বেরোনো (সংক্রমণ হয়ে থাকলে)।
৪. জ্বর আসা (এটিও সংক্রমণের লক্ষণ)।
৫. কানে একটানা ঝিঁ ঝিঁ শব্দ হওয়া।

ডাক্তারকে কখন দেখাবেন?

১. যদি কানে আঘাত লাগার পর উপরের সমস্যাগুলি হয়, তাহলে দেরি না করে ডাক্তারকে দেখান।
২. আঘাত ছাড়াও কান থেকে রস গড়াতে পারে। কানে ব্যথা থাকতে

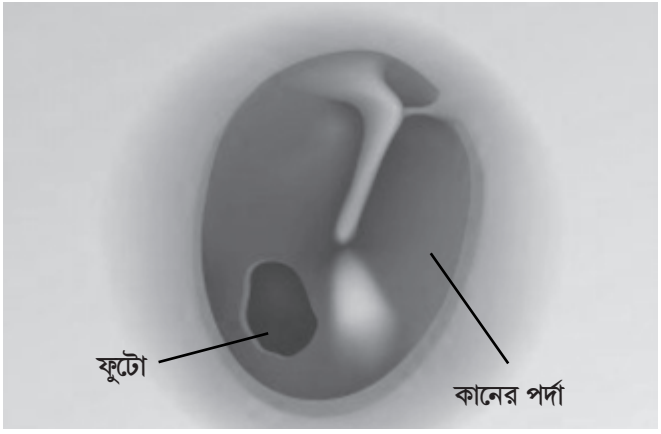

বা নাও থাকতে পারে। দীর্ঘস্থায়ী মধ্যকর্ণ সংক্রমণে (Chronic Suppurative Otitis Media) যখনই সংক্রমণ বেড়ে ওঠে তখন পর্দার পেছনে পুঁজ জমে কানে ব্যথা হয়। পর্দায় ফুটো হয়ে পুঁজ বেরিয়ে গেলে ব্যথা কমে যায়। রোগী ভাবেন সমস্যা কমে গেল। সংক্রমণ কিন্তু কমে না। পরে আবার একই জিনিস ফিরে হতে পারে।

৩. বাচ্চারা অনেকসময়ই বুঝিয়ে উঠতে পারে না সমস্যাটা কোথায় হচ্ছে। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে বারবার কানে ব্যথা, কান চুলকানো, সর্দিকাশি, বসে বা দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে টাল খেয়ে যাওয়া হতে পারে। বাচ্চার এই সমস্যা হলে বা বাচ্চা কম শোনে বলে সন্দেহ করলে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যান। অবশ্যই সত্যেন্দ্রনাথের বাবার মতো করবেন না যেন।

চিকিৎসা কী?

চিকিৎসার উদ্দেশ্য তিনটি।

১. কানে ব্যথা কমানো—ব্যথার জন্য প্যারাসিটামল বা আইবুপ্রোফেন খাওয়া যেতে পারে। বাচ্চাদের অ্যাসপিরিনজাতীয় ওষুধ দেওয়া যাবে না।

২. কানের পর্দায় ফুটোর সঙ্গে সঙ্গে মধ্যকর্ণের সংক্রমণও হয়ে থাকলে একমাত্র তবেই অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়া যুক্তিযুক্ত। সংক্রমণ না থাকলে অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে লাভ নেই। এমনকী জেন্টামাইসিন, এরিথ্রোমাইসিন জাতীয় বেশ কিছু অ্যান্টিবায়োটিক কানের স্নায়ুর ক্ষতিই করে। বরং চেষ্টা করা উচিত যাতে সংক্রমণ না হয়। সংক্রমণ না হলে ছোটোখাটো ফুটো আপনা-আপনি জুড়ে যাবে। বড়ো ফুটো হয়ে থাকলে অনেকক্ষেত্রেই অপারেশন লাগে।

৩. কানের পর্দা জোড়ার অপারেশনকে টিম্প্যানোপ্লাস্টি (Tympanoplasty) বলে। কানের উপরের অংশের চামড়ার বিশেষ অংশ (টেম্পোরালিস ফাসা) কেটে নিয়ে ফুটো জোড়া লাগানো হয়। এখন অনেকসময় কৃত্রিম গ্র্যাফটও ব্যবহার করা হয়। অনেকসময় পর্দায় ফুটোর সঙ্গে সঙ্গে মধ্যকর্ণের হাড়ের ক্ষয়ক্ষতিও হয়ে থাকতে পারে। এই অপারেশনে সেটাও যতদুর সম্ভব সারানোর চেষ্টা করা হয়।

কানে ফুটো হয়ে থাকলে কী কী করা যাবে না?

কানে ফুটো হয়ে থাকলে যাতে সংক্রমণ না হয় তার জন্য

১. কানে কিছু ঢোকানো যাবে না। তুলোর কানখুঁচুনিও না।

২. কানে যাতে জল না ঢোকে। অর্থাৎ পর্দা না জোড়া পর্যন্ত সাঁতার কাটা যাবে না। স্নান করার সময় সাবধান থাকতে হবে।

৩. কানে ফুটোর জন্য টিম্প্যানোপ্লাস্টি অপারেশন হয়ে থাকলে ওপরের সাবধানতাগুলি অবলম্বন করতেই হবে। তার সঙ্গে খুব জোরে হাঁচা বা কাশা যাবে না। তাতে জোড়া লাগানো গ্রাফট সরে বা খুলে যেতে পারে।

মনে রাখবেন কানে ফুটোর সঙ্গে সঙ্গে সংক্রমণ হয়ে থাকলেও দীর্ঘদিন তার চিকিৎসা না করানো হলে সেই সংক্রমণ,

১. অন্তঃকর্ণে ছড়িয়ে পড়ে স্নায়ুর স্থায়ী ক্ষতি করতে পারে।

২. কানের পেছনের ম্যাস্টয়েড নামক হাড়ে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ে স্থায়ীভাবে শোনার ক্ষমতা চলে যেতে পারে।

৩. বিরল কিছু ক্ষেত্রে মস্তিষ্কে (মেনিঞ্জাইটিস) বা রক্তে (সেপসিস বা ব্যাকটিরিমিয়া) সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়তে পারে, যা জীবনঘাতীও হতে পারে।

কাজেই, কানে আঘাত লাগলে, কম শুনছেন বলে মনে হলে, বা কান থেকে রস বা পুঁজ গড়ালে অবশ্যই ডাক্তার দেখান। ফেলে রাখলে আপনারই ক্ষতি। কানের পর্দায় ফুটো এমনকিছু বড়ো রোগ নয়, কিন্তু সংক্রমণ হয়ে গিয়ে কানের ভেতরের স্নায়ু একবার নষ্ট হয়ে গেলে তা আর কখনোই সারানো সম্ভব নয়। তখন সেই সুকুমার রায়ের কানা আর কালার গল্পের মতো অবস্থা হবে। কানা আর কালা, ধরুন আমি আর আপনি, দু-বন্ধু পাড়ায় নাচগানের অনুষ্ঠান দেখতে গেছি। ফিরে এসে তক্কাতক্কি থেকে হাতাহাতি লেগে যাওয়ার জোগাড়। আপনি বলবেন "আজ খালি নাচটাই হল, গানটা বোধহয় পরের দিন হবে", আর কানা আমি বলব "কই! আজ তো গান শুনলাম খালি। নাচটা বোধহয় পরের দিন হবে।" আমাদের কেষ্টঠাকুর কিন্তু কানা কালা দুটোই! স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. অপূর্ব, এমবিবিএস, শ্রমজীবী মানুষদের জন্য তৈরি এক ক্লিনিকের সঙ্গে যুক্ত।

বিষম খেয়ে মৃত্যু আর নয়

গলার মধ্যে খাবার বা অন্য কিছু আটকে গিয়ে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। সহজ 'হেমলিক প্রকৌশল' জেনে এমন মৃত্যু ঠেকানো যায়—লিখেছেন **সৌম্য সেনগুপ্ত।**

এমন ভাবেও আসে মৃত্যু?

ঘটনা ১. ৩ মার্চ ২০১৭ ,বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরে হাজরাপাড়ার তিন বছরের এক শিশু কাঁদছিল। তার কান্না ভোলাতে গিয়ে, তাকে ভালোবেসে এক মানুষ, তার মুখে তুলে দেন চানাচুর। কান্নার সময় জোরে জোরে শ্বাসপ্রশ্বাস নিই আমরা । শিশুটিও তাই করছিল। শিশুটির শ্বাসের সাথে খাবারের কণা গিয়ে খাদ্যনালীতে না গিয়ে ঢুকে গেল শ্বাসনালীতে। শ্বাসনালীর শুরুর দিকের পেশি সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে দিল রাস্তা। শ্বাসরোধ হয়ে ছটফট করতে করতে তিন-চার মিনিটের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে গেল এই শুরু হওয়া ছোট্ট শিশুটির জীবন। সব্বার সামনে। অথচ এই মৃত্যু কি আটকানো যেত না? যেত। নিশ্চিত যেত! কেমন ভাবে? জেনে নেব আমরা।

ঘটনা ২. ১৫ মার্চ ২০১৭, মঙ্গলকোটের জিলু শেখ বিয়েবাড়িতে খেতে গিয়েছিলেন। মাংসের হাড়ের মধ্যে থাকা মজ্জা খাবার জন্য হাড় মুখের ভিতর নিয়ে জোরে শ্বাসের সঙ্গে টেনে নিতে গেলেন । স্বাভাবিকভাবে খাবার খেলে খাবার যায় খাদ্যনালীতে। কিন্তু এক্ষেত্রে বাতাসের সঙ্গে ভেসে মাংসের অংশ উড়ে ঢুকে গেল শ্বাসনালীতে। এই পথ কেবলমাত্র বাতাসের আসা যাওয়ার জন্য। বাতাস ছাড়া আর কিছুর প্রবেশাধিকার নেই এই পথে। শ্বাসরোধ হয়ে গেল। দমবন্ধ হয়ে ছটফট করতে করতে মারা গেলেন ভদ্রলোক। বিয়েবাড়ির আনন্দের পরিবেশ পরিণত হল শোকের পরিবেশে। অথচ এই মৃত্যু কি আটকানো যেত না? যেত। নিশ্চিত যেত! এমনকী জিলু শেখ মহাশয় কি নিজেই নিজেকে বাঁচাতে পারতেন না? পারতেন। প্রায় নিশ্চিত পারতেন। কেমন ভাবে? জেনে নেব আমরা।

দুটো জীবন হারানোর, কিংবা বলা ভালো জীবনকে বাঁচাতে না পারার নিদারুণ দুঃখের কথা দিয়ে শুরু করেছি এই লেখা। আসুন এবার কয়েকটা জীবন বাঁচানোর অফুরান আনন্দের ঘটনার কথা আপনাদের জানাই। শুরুতেই জানাই আমার জীবনের এক অন্যতম স্মরণীয় দিন।

ঘটনা ৩. ২০১২ সালের ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহ। আমার স্কুল রাধানগর বোর্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির ক্লাসে চলছে "২১শে ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপনের" প্রস্তুতি। আমার সামনে কয়েকজন সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে কবিতা বলছে। এমন সময় হঠাৎ দেখি ২য় সারির বেঞ্চে বসে থাকা শীতল বেঞ্চের উপর উঠে আমাকে আকুলভাবে ইশারায় ডাকছে। মুখ দিয়ে কোনো আওয়াজ নেই। ওর চোখ মুখ দেখেই বুকটা ছলাত করে উঠল! পড়িমরি করে কাছে গিয়ে কী হয়েছে জিজ্ঞেস করতে কোনো উত্তরই দিতে পারল না ও।

ঘটনাক্রমে দিন পনেরো আগে *অসুখ বিসুখ পত্রিকা*-র ৩৬ সংখ্যায় বিজ্ঞানকর্মী শান্তিময় সৎপতি দাদার লেখা পড়া ছিল। শীতলের অবস্থা দেখে মনে হল ওর শ্বাসরোধ হয়নি তো? ! সঙ্গে সঙ্গে ওকে পেছন থেকে জাপটে ধরে বেশ কয়েকবার "হেমলিক প্রকৌশল" প্রয়োগ করতেই হঠাৎ খক করে কেশে উঠল, বেরিয়ে এল শ্বাসনালীতে ঢুকে শ্বাসরোধ ঘটিয়ে ফেলা ছোট্ট এক প্লাস্টিকের টুকরো। আর সঙ্গে সঙ্গে গভীর শ্বাস নিতে শুরু করে আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে উঠল শীতল।

কী ঘটেছিল শীতলের? ব্যাগ পুরানো হয়ে গেলে ব্যাগের গায়ের প্লাস্টিক ঝুরঝুরে হয়ে যায়। সেই রকম এক প্লাস্টিক নিয়ে মজা করতে গিয়ে মুখের সামনে ধরে জোরে শ্বাসের সঙ্গে মুখে টেনে নিতে যায়। ব্যস। তা ঢুকে পড়ে শ্বাসনালীতে। সঙ্গে সঙ্গে দমবন্ধ হয়ে গেলে ও জল খাওয়ার চেষ্টা করে, মুখে আঙুল ঢুকিয়ে বের করার চেষ্টা করে। সবেতেই বিফল হলে বন্ধুদের ইশারা করে বলে আমাকে ডাকতে। তারা কেউ বোঝেনি। শেষে মরিয়া হয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বেঞ্চে উঠে পড়ে। আর তার পর . . . ।

আমি জানি না *অসুখ বিসুখ*-এর ওই লেখা না পড়া থাকলে আমাদের জীবন কোন পথে বইত।

এই ঘটনার পরেই আমরা একটি টিউটোরিয়াল ভিডিও বানাই। সাপের কামড়ে মানুষের মৃত্যু আটকাতে হয়ে-চলা নানা কর্মকাণ্ডের অন্যতম ব্যক্তিত্ব ডা. দয়াল বন্ধু মজুমদার তা আপলোড করেন তাঁর ইউটিউব পেজে (https://www.youtube.com/watch?v=CtBSAf-PX_DM)।

ঘটনা ৪. ১০ জুন ২০১৭, রাত ১১ টা ৫০। অশোকনগর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে গলায় আলু আটকে শ্বাসরোধ হওয়া রোগীকে বাঁচিয়ে তুললেন বাড়ির লোকেরাই। কারণ "হেমলিক প্রকৌশল" কেমনভাবে প্রয়োগ করতে হবে তা তাঁদের সুন্দর করে বুঝিয়ে দেন ডা. অপর্ণা ভট্টাচার্য। হ্যাঁ, এই প্রক্রিয়া সফলভাবে একজন সাধারণ মানুষই প্রয়োগ করতে পারেন।

ঘটনা ৫. গত ১০ নভেম্বর ২০১৭; দুপুর একটা নাগাদ ফোন এল বিষ্ণুপুরের রাজাদার কাছ হতে। চূড়ান্ত উৎকণ্ঠিত রাজাদা বললেন, 'ছেলের গলায় চকোলেট আটকে গেছে! ছটফট করছে! কোনখানে চাপ দেব যেন?' 'নাভির কাছে' . . . আমার উত্তর শুনেই কেটে গেল ফোন। কিছু পরেই হোয়াটস অ্যাপে ভেসে এল 'ভিডিওটি দেখা না থাকলে হয়তো জীবনটা অন্য ধারায় বইত।' পরের দিন তিনিই জানালেন, 'জানেন, আমাদের পাড়ারই একটা ৬ মাসের শিশু গলায়

ডাল আটকে মারা গেল . . . ইশ যদি ওদের এই পদ্ধতিটা জানা থাকত!'

ঠিক একইভাবে আমার স্কুলের শিক্ষক সাহেব দে তাঁর বাবাকে বাঁচান। কাঁকিল্যায় ভাগনি অন্বেষাকে বাঁচিয়েছেন অনন্যা গঙ্গোপাধ্যায়, পাচাল গ্রামের ভৈরব সাইনী তাঁর দিদিকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচান ।

উল্লেখযোগ্য আরেকটি ঘটনা হল আহমেদাবাদের জীগর উপাধ্যায় নিজের উপর হেমলিক কৌশল প্রয়োগ করে নিজেকেই বাঁচিয়ে তোলেন। আমাদের বানানো ভিডিও কাজে লেগেছে, এর চেয়ে বড়ো পাওয়া আর কীই-বা থাকতে পারে।

এতক্ষণে আমরা বুঝে গেছি শ্বাসরোধ হলে আক্রান্ত ব্যক্তিকে বাঁচানোর বা নিজেই নিজেকে বাঁচানোর একমাত্র পদ্ধতি হেমলিক ম্যানুভার (কৌশল)। বিখ্যাত কারডিয়োথোরাসিক সার্জেন ডা. হেনরি জে হেমলিক ১৯৭৪ সালে এই সাধারণ অথচ অসাধারণ কাজের তথা জীবনদায়ী এই পদ্ধতি আবিষ্কার করেন । আসুন আমরাও শিখে রাখি এই পদ্ধতি।

তবে তার আগে আসুন একটু জেনে নিই।

কখন আমাদের শ্বাসরোধ ঘটে ? কী ঘটে গলার ভিতর ?

আমাদের গলার ভেতরের নালীপথের প্রস্থচ্ছেদের ছবি দেখলেই বুঝব, গলার শুরুর অংশটা অনেকটা চৌরাস্তার মতো। নাক ও মুখের নালী এক হয়ে পরে আবার দু-ভাগে ভাগ হয়েছে। একটা শ্বাসনালী আর

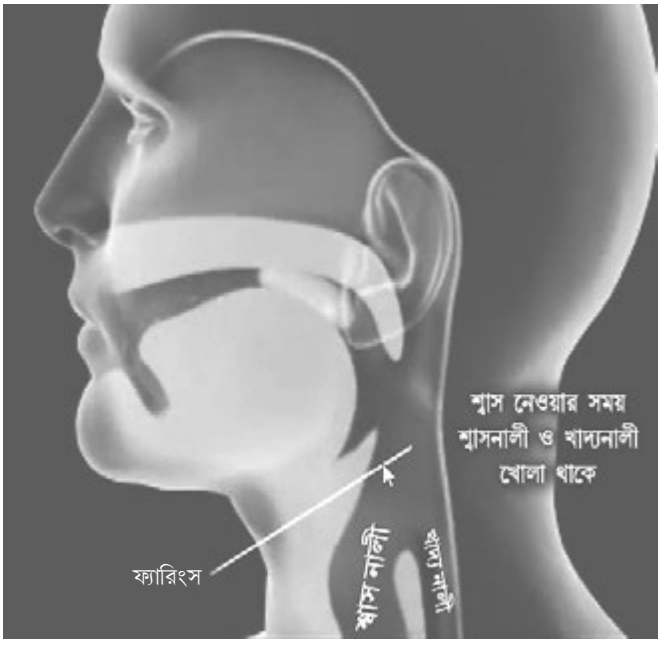

চিত্র ১.

চিত্র ২.

অন্যটা খাদ্যনালী। নাক বা মুখ দিয়ে বাতাস টানলে তা সামনের শ্বাসনালী হয়ে যায় ফুসফুসে। তা খাদ্যনালী হয়ে যায় না। কারণ বুকের খাঁচা বেড়ে মধ্যচ্ছদা নীচের দিকে নেমে ফুসফসের মধ্যেই বাতাসের চাপ কমে। তাই ফুসফুসের মধ্যেই বাতাস ঢোকে। আবার নিশ্বাসের সময় বাতাস নাক ও মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে।

আবার খাদ্যনালীর মধ্যে দিয়েও বাতাস পাকস্থলীতে যেতেই পারে। এ ঘটনা বেশি ঘটে শিশুদের ক্ষেত্রে যখন তারা বুকের দুধ চুষে খায়। কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে শক্ত বস্তুকে নিয়ে। ওই চৌরাস্তায় এক অতি সচেতন সদা সতর্ক ট্রাফিক কন্ট্রোলার তথা পেশি (এপিগ্লটিস) আছে যা তরল বা কঠিন বস্তুর সংস্পর্শে এলেই শ্বাসনালীর রাস্তা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেয়। (২ নং চিত্র দেখুন)। ফলে তরল বা কঠিন বস্তু খাদ্যনালীর মধ্যে দিয়ে চলে যায়। এ তো এক স্বাভাবিক ব্যাপার। কোটি কোটি মানুষের শরীরে জন্ম থেকে মৃত্যু অব্দি হয়ে চলেছে।

তাহলে কখন ঘটে বিপত্তি ?

১. খেতে খেতে ঢোঁক গেলা ও কথা বলার কাজ একসঙ্গে করতে গেলে। কারণ কথা বলার জন্য শ্বাসনালী থেকে বাতাসের বেরিয়ে আসা প্রয়োজন। ফলে এপিগ্লটিস খুলে ফেলে শ্বাসনালীর পথ, আর সেই সময় খাবার, পানীয় ইত্যাদি চৌরাস্তায় হাজির হলে তা ঢুকে পড়ে শ্বাসপথে।

২. গভীরভাবে শ্বাস নিয়ে খাবারের (বা শক্ত) কণা শুষে খাওয়ার চেষ্টা করলে। (২ ও ৩ এর ঘটনা খেয়াল করুন।) এক্ষেত্রে এপিগ্লটিস শ্বাসনালীকে সম্পূর্ণরূপে খোলা রাখে।

ফলে একবার কঠিন বস্তু বা কণা শ্বাসনালীর পথে ঢুকে পড়লে একটা নির্দিষ্ট বিপদসীমা অব্দি শরীর সামলে নেয় কাশির মাধ্যমে। কাশির সময় অনেকটা বাতাস ফুসফুসে ঢোকে, তারপর এপিগ্লটিস

শ্বাসনালীর পথ বন্ধ করে দেয়। ডায়াফ্রাম বা মধ্যচ্ছদা ফুসফুসে চাপ বাড়ায় এবং হঠাৎ এপিগ্লটিস খুলে যাওয়ায় খুব দ্রুত বেগে বাতাস বেরোয়, এবং বাতাসের সাথে ওই অবৈধ অনুপ্রবেশকারী কঠিন বা তরল বস্তু বেরিয়ে পড়ে।

একেই বলে বিষম লাগা। তাই যদি কেউ কাশেন তাঁকে কাশতে উৎসাহিত করুন। কারণ জেনে রাখুন সে যাত্রা তিনি শ্বাসরোধ হওয়া থেকে বেঁচে গেলেন ।

কিন্তু যদি কঠিন বা তরল বস্তু বিপদসীমা পেরিয়ে যায় তাহলে শ্বাসনালীর স্বাভাবিক প্রতিবর্ত ক্রিয়ায় ওই অংশের পেশি সংকুচিত হয়ে এক্কেবারে বন্ধ হয়ে যায় ।

ফলে তিনি আর শ্বাস নিতে পারেন না। এই অবস্থাকেই বলে শ্বাসরোধ বা চোকিং।

শ্বাসরোধ হলে কী ঘটে?

১. দুর্ঘটনাগ্রস্ত ব্যক্তি শ্বাস নিতে ও কথা বলতে পারেন না।
ফলে অন্যকে নিজের কষ্টের কথা জানাতে পারেন না।
২. শরীরের কোষ ও কলা অক্সিজেন না পেয়ে নীল হতে থাকে।
৩. মস্তিষ্কে অক্সিজেন সরবরাহ বন্ধ হওয়ায় ওই ব্যক্তি অচেতন হয়ে পড়েন।

চিত্র ৩. কীভাবে বুঝবেন একজনের শ্বাসরোধ হয়েছে ?

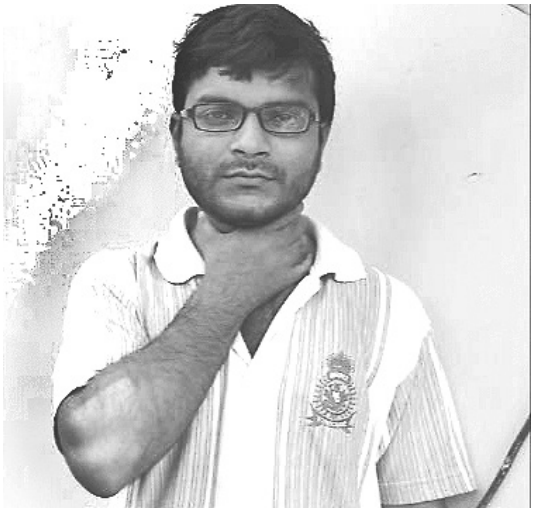

এর অর্থ "বাঁচান! আমার দম বন্ধ হয়ে গেছে।" আবিষ্কর্তার নাম অনুসারে এই চিহ্ন বা ইশারাকে হেমলিক চিহ্ন (Heimlich Sign) বলে।

চিত্র ৪. অন্যকে কীভাবে বোঝাবেন আপনার শ্বাসরোধ হয়েছে ?

তাহলে হেমলিক কৌশল কেন ?

এই সময় বাঁচা বা বাঁচানোর একটিই উপায়। শ্বাসরোধ হওয়ার আগে ফুসফুসে যে বাতাস ছিল, ডায়াফ্রামে চাপ দিয়ে তাকে শরীর থেকে বের করে আনা। ব্যাপারটা কেমন, আগ্রহী পাঠক একটা ছোট্ট পরীক্ষার সাহায্যে হাতেকলমেও বুঝে নিতে পারেন। একটা প্লাস্টিকের বোতল নিন। মুখে কাগজ গুঁজে দিন (চিত্র ৫)। এবার হঠাৎ বোতলের পেট দু-হাত দিয়ে জোরে চিপে দিন। দেখুন ভেতরের বাতাস ঠেলা মেরে বোতলের মুখে চেপে থাকা কাগজকে ছিটকে বের করে দেবে (চিত্র ৬)।

চিত্র ৫.

চিত্র ৬.

কৌশলটা কেমন ?

খেয়াল রাখুন আক্রান্ত ব্যক্তি যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন (দাঁড়িয়ে-বসে-শুয়ে) সেই অবস্থাতেই তার উপর এই কৌশল প্রয়োগ করতে হবে। মনে রাখতে হবে যা করার মিনিট চারেকের মধ্যেই করতে হবে।

আক্রান্ত ব্যক্তি দাঁড়িয়ে থাকলে পেছন থেকে আক্রান্ত ব্যক্তির হাত ও

চিত্র ৭.

চিত্র ৮.

চিত্র ৯.

চিত্র ১০.

শরীরের মধ্যে দিয়ে দুটো হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে নাভিমণ্ডলে এক হাত মুঠো করে অন্য হাত দিয়ে মুঠো হাতের আঙুলগুলিকে চিপে ধরে মুঠো হাতের বুড়ো আঙুলের অংশ নাভিতে ঠেকিয়ে চাপ দিয়েই হাতে মোচড় দিয়ে আক্রান্ত ব্যক্তির পাঁজরের নীচে চাপ দিয়ে তুলে ধরার চেষ্টা করতে হবে। এটা সফলভাবে হবে যদি হাত দুটোকে চাপ দেওয়ার সময় মোচড় দেওয়া যায়। হাতে ঘুড়ির লাটাই থেকে সুতো বেরোনোর সময় লাটাই যেদিকে ঘোরে মোচড় সেই দিকে দিতে হবে। এর ফলে বুকের খাঁচার নীচে থাকা ডায়াফ্রামে চাপ পড়বে ফলে ফুসফসের বাতাসে চাপ পড়বে ও বাতাসের চাপে আটকে যাওয়া রাস্তা খুলে যাবে। (চিত্র ৭, ৮, ৯, ১০ দেখুন)।

এমনকী গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রেও এই একই পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে।

১ বছরের কম বয়সি কোনো শিশু এরকম দুর্ঘটনায় পড়লে

প্রথম ধাপ

১. শরীরের সামনে দিক দিয়ে একটি হাতে শিশুর গলা ধরে;

২. শিশুকে এক হাতের উপর উপুড় করে ধরতে হবে যাতে শিশুর মাথা শরীর থেকে নীচের দিকে থাকে;

৩. এই অবস্থায় অন্য হাতের তালুর গোড়া দিয়ে শিশুর পিঠের দু-দিকের ত্রিভুজাকৃতি হাড়ের (স্ক্যাপুলা) মাঝে পাঁচ বার হালকা থাপ্পড় বা ধাক্কা দিতে হবে।

এতে কাজ না হলে—

দ্বিতীয় ধাপ

১. এবার সঙ্গে সঙ্গে শিশুকে উলটে ঘাড় ধরে রেখে আনতভাবে চিত করে হাতের উপর রাখতে হবে।

২. অন্য হাতের দুই বা তিন আঙুলের ডগা দিয়ে শিশুর বুকের ঠিক মাঝে ৫ বার চাপ দিতে হবে।

৩. চাপ দেওয়ার সময় আঙুল প্রায় ১ ইঞ্চি ঢুকে যাবে।

৪. এতেও শ্বাসক্রিয়া শুরু না হলে মুখের মধ্যে বের করা যায় এমন কিছু আছে কিনা পরীক্ষা করে নিতে হবে। থাকলে বের করে দিতে হবে। না পেলে আবার আগের প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। (দেখুন চিত্র ১১)।

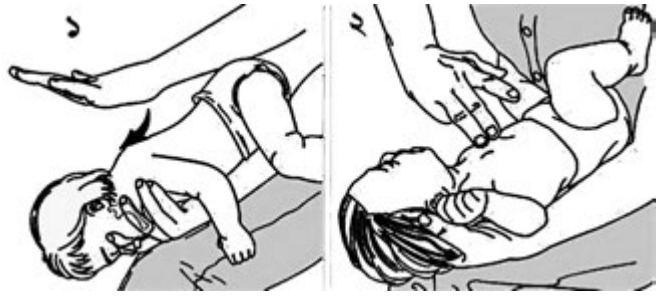

চিত্র ১১.

নীচের ছবিগুলি সাহায্যে আমরা বুঝে নেব ।

*বসতে পারে এমন শিশুর ক্ষেত্রে কোলে বসিয়ে আঙুলের সাহায্যে হেমলিক কৌশল প্রয়োগ করব (চিত্র ১২)।

*উদ্ধারকারী আকারে ছোটো হলে বা আক্রান্ত ব্যক্তি শুয়ে থাকলে কীভাবে প্রয়োগ করব (চিত্র ১৩)।

*আক্রান্ত ব্যক্তি নিজে নিজের উপর কীভাবে এই কৌশল প্রয়োগ করবেন (চিত্র ১৪) । জীগর উপাধ্যায় যেভাবে নিজে নিজের উপর এই কৌশল প্রয়োগ করেছিলেন।

চিত্র ১২.

চিত্র ১৩.

চিত্র ১৪.

শেষের কথা

মৃত্যুর মাত্র কয়েকমাস আগে, ২০১৬ সালের মে মাসে, ডা. হেমলিক তাঁর নিজেরই আবিষ্কৃত পদ্ধতিতে, নিজের ৯৬ বছর বয়সে ৮৭ বছরের প্যাটি রিস নামে মহিলাকে বাঁচিয়ে তোলেন। এই পদ্ধতিতে কোনো রোগীর জীবন বাঁচিয়ে তোলার কাজ একজন ডাক্তার হিসাবে তিনিই হয়তো প্রথম করেন। এখনও পর্যন্ত এই পদ্ধতিতে প্রায় লক্ষাধিক মানুষের জীবন বেঁচেছে। বাঁচিয়ে তুলেছেন কিন্তু আপনার আমার মতো সাধারণ মানুষ।

আমরা যা করছি—ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির বন্ধুরা, শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগ, রুরাল মেডিক্যাল প্র্যাক্টিশনারস অ্যাসোসিয়েশন প্রভৃতি সংগঠনের বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে পথে-প্রান্তরে স্কুলে ম্যানিকুইন সহযোগে শিখিয়ে চলেছি এই পদ্ধতি।

ডা. হেমলিক তাঁর নিজেরই আবিষ্কৃত পদ্ধতিতে, নিজের ৯৬ বছর বয়সে ৮৭ বছরের প্যাটি রিস নামে মহিলাকে বাঁচিয়ে তোলেন। এই পদ্ধতিতে কোনো রোগীর জীবন বাঁচিয়ে তোলার কাজ একজন ডাক্তার হিসাবে তিনিই হয়তো প্রথম করেন।

আমরা যা করতে পারি—আসুন সব্বাই মিলে জেনে রাখি এই পদ্ধতি। জানিয়ে রাখি সক্কলকে। পাড়ার আড্ডা-সেমিনার-পথসভা কিংবা ঘরোয়া আলোচনায় উঠে আসুক এই চমৎকার বিষয়টি। প্রতিটি স্কুল সিলেবাসে অন্তর্ভুক্তি ঘটুক এই বিষয়টির। আর আপনারা আয়োজন করলে আমরা হইহই করে পৌঁছে যেতেই পারি আপনাদের এলাকায় ।

কারণ ‘বিদ্যেবোঝাই বাবু মশাই’ যতই হই না কেন এই ধরনের জীবনদায়ী শিক্ষা ছাড়া জীবনটা ‘ষোলোআনাই মিছে’। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

লেখক বিদ্যালয় শিক্ষক, বিজ্ঞানকর্মী ও প্রাবন্ধিক।

Advt.

অনীক

‘অনীক’ পত্রিকা বিগত ৫০ বছরের বেশি সময় ধরে চেষ্টা করেছে সমসাময়িক গণতান্ত্রিক ও বিপ্লবী রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অংশ হতে। ‘অনীক’-এর বয়োপ্রাপ্তির ইতিহাস তাই সমকালীন গণ-আন্দোনের চলমান দর্পণও বটে। কোনো বিশেষ দল বা গোষ্ঠীর মুখপত্র না হয়েও, সামাজিক দায়বদ্ধতার অঙ্গীকারে অবিচল থেকে সমকালীন রাজনীতি-অর্থনীতি ও সামাজিক প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে--রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ ছাড়াও গল্প-কবিতা-নাটক ইত্যাদির মাধ্যমে।

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ১৫০ টাকা (সডাক)

অনীক, প্রযত্নে: পিপলস বুক সোসাইটি। ১০/২ বি রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। কলকাতা-৭০০০০৯

ফোন-৯৪৩২৮৭৭৫৬০/৯৮৩০১৪৩৩৬৫/৯৪৩৩৭২৪৪৬২

অমনোযোগী দুরন্ত বাচ্চার সমস্যা

ডা. সুমিত দাশ

রাজার কথা

ফুটফুটে বাচ্চার নাম রাখা হল রাজা। ছেলে বাড়ছে স্নেহে, বাড়ছে দুরন্তপনাও। বাবা, চাপে থাকা প্রাইভেট কোম্পানির বড়ো অফিসার, মা সরকারি স্কুলের শিক্ষিকা। তাই ছেলের বেশিসময় কাটে দাদু ঠাকুমার কাছেই। সেখানে এই দুরন্তপনা প্রশ্রয়ই পায়। ছেলে দুষ্টুমি করতে গিয়ে কোথাও পড়ে গেলে সেই জায়গাটাকেই মারা হয়, ছেলেকে কিছুই বলা হয় না। মায়ের কিন্তু নজর পড়েছে। আড়াই বছর বয়সে স্কুলে যাওয়ার অভ্যাস করার জন্যও রাজাকে দেওয়া হল এক গজিয়ে ওঠা 'প্লে স্কুলে' সেখানে কিছু কিছু অভিযোগ এল। বছরখানেক কাটিয়ে এক ইংরাজি মাধ্যম মোটামুটি নামকরা স্কুলে দেওয়া হল। ইন্টারভিউয়ের সময় ছোটোখাটো একটা সমস্যা হয়েছিল—রাজা চেয়ার থেকে নেমে গিয়ে প্রিন্সিপালের টাইটা টেনে দিয়েছিল। প্রিন্সিপালের হাতটা চড়ের মতো আকার নিতে গিয়েও টাই ঠিক করতে ব্যস্ত হয়ে উঠল বাবা মায়ের পকেটের জোর আর আগের দিন এক রাজনৈতিক দাদার ভর্তির 'অনুরোধের' ফোনের কথা ভেবে। তিনি নাকি আবার রাজার মায়ের এক মাসতুতো বোনের পিসতুতো নন্দাই।

স্কুল থেকেও নানা অভিযোগ আসতে থাকল। রাজা খুব চঞ্চল, সবসময় ছটফট করে, প্রশ্ন সবটা না শুনে উত্তর দেয়। অন্য বাচ্চাদের সঙ্গে ঝামেলায় জড়ায়। কাগজের স্বাস্থ্য পত্রিকা ও টিভির মনোবিদদের আলোচনা শোনার দৌলতে রাজার মা বুঝল সমস্যা আছে, মনোবিদের কাছে যেতে হবে। খাওয়ার টেবিলে কথাটা তুলতেই দাদু ঝাঁঝিয়ে উঠলেন—তার মানে? রাজা কি পাগল। আর ঠাকুমা নিশ্চিন্ত ছিলেন—ওর বাবাও ছোটোবেলায় ছটফটে ছিল, বড়ো হলে ঠিক হয়ে যাবে।

রাজার রেজাল্ট প্রত্যেক ক্লাসেই খারাপ হতে থাকল। ক্লাস টেনে টেনেটুনে বোর্ড এক্সাম পাশ করল। তবে সত্যি সত্যিই চঞ্চলতা অনেক কমে গেল, ঠাকুমা বললেন—বলেছিলাম না!

কিন্তু অন্যদিকে শুধুই খারাপ খবর। রাজা গাঁজা খাওয়া শুরু করল। দামি মোবাইল দিয়ে শুরু করে বাইকের ডিম্যান্ড। বন্ধুবান্ধব নিয়ে আড্ডা। রাতে করে বাড়ি ফেরা। রাজা যখন কোনো রকমে ফার্স্ট ইয়ার—গাঁজা, মদ, হেরোইন কোনো নেশাই বাকি নেই। শেষ খবর পাওয়া যাচ্ছে সে এখন এক নেশা ছাড়ানোর সেন্টারে ভর্তি। রাজার আর রাজা সাজা হল না।

গল্পের মধ্যে গল্পটা কী?

একটা মানসিক রোগ আছে যাকে বলা হয় অ্যাটেনশান ডেফিসিট হাইপার অ্যাকটিভিটি ডিসঅর্ডার (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) যাকে সংক্ষেপে ADHD বলা হয়। বাংলায় বললে বলতে হয় অমনোযোগিতা এবং অতিচঞ্চলতা রোগ। সুবিধার জন্য আমরা ADHD বলব।

সাধারণত ছ-বছরের আগেই রোগের উপসর্গ দেখা দেয়। সবথেকে বেশি দেখা যায় অতি চঞ্চলতা (hyperactivity) তারপর মনোযোগের অভাব (attention deficit) তারও পরে আসে আবেগের সমস্যা বা উত্তেজনাপ্রবণতা (impulsivity)।

মনোযোগের অভাব নানাভাবে বোঝা যায়। স্কুলের কাজে ছোটো ছোটো ভুল করা, ভুলে যাওয়া, বিষয় থেকে সহজে সরে যাওয়া, জিনিসপত্র হারিয়ে ফেলা, পড়ানোর সময় ঠিকমতো না শোনা এবং তাকে দেওয়া নির্দেশ ঠিকমতো বুঝতে না পারা ইত্যাদি।

অতিচঞ্চলতা এবং উত্তেজনা নানা উপসর্গ নিয়ে আসে। শান্ত জায়গায়ও চুপচাপ বসতে না পারা, ছটফট করা, খুব বেশি বক বক করা, চিৎকার করা, নিজের জায়গা ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে যাওয়া, নিজের সময় আসার আগেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করা, চিন্তা না করে কাজ করা, বিপদ না বুঝেই কোনো কাজ করা, বিভিন্ন বিষয়ে স্বাভাবিক ভয় না পাওয়া ইত্যাদি।

এর ফলে শিশুটির পড়াশুনো খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বন্ধু তৈরি করতে পারে না বা সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ করতে পারে না।

দেখা গেছে মোটামুটি শতকরা ৪০ ভাগ বাচ্চা বড়ো হতে হতে ১২-২০ বছরের মধ্যে অধিকাংশ উপসর্গ চলে যায়। সবার আগে কমে চঞ্চলতা। তাই বাবা মা ভাবে সন্তান ভালো হয়ে গেছে। যেটা গল্পের রাজার হয়েছিল। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই চলে আসে নেশার সমস্যা বা আচরণ সমস্যা (conduct disorder)।

শতকরা ৬০ ভাগ ক্ষেত্রে প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে ADHD উপসর্গ থাকে। অনেক ক্ষেত্রে উপসর্গগুলো সূক্ষ্মভাবে থাকে। চঞ্চলতা কমলেও বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কাজের চাপ বেড়ে যাওয়ায় এদের অমনোযোগিতা আরও বেড়ে যায়। একটা কাজ শেষ হওয়ার আগেই আর একটা কাজ শুরু করে। কোন কাজকে বেশি প্রাধান্য দেবে বুঝতে পারে না। গুছিয়ে কাজ করতে পারে না। প্রচুর ভুলে যায়, উত্তেজিত হয়ে পড়ে। মেজাজ

ঠিক রাখতে পারে না। শান্তভাবে আলোচনা করতে পারে না, অল্পতেই চিৎকার করে ওঠে। এরা খুব দুর্ঘটনাপ্রবণ হয়।

আর কী গল্প?

ADHD-র সঙ্গে অনেকক্ষেত্রেই আরও অন্যান্য রোগ থেকে আক্রান্ত মানুষটার সমস্যা আরও জটিল হয়ে ওঠে। শিশুদের ক্ষেত্রে ADHD-র সঙ্গে থাকতে পারে শিক্ষণ সমস্যা (Learning Disability), অবাধ্য আচরণ সমস্যা (Conduct Disorder), অবসাদ (Depression), অটিসটিক ডিসর্ডার (Autistic Disorder) ইত্যাদি। প্রাপ্তবয়স্কদের থাকতে পারে ব্যক্তিত্বের সমস্যা (Personality Disorder), OCD (Obsessive Compulsive Disorder) বাইপোলার ডিসর্ডার (Bipolar Disorder) ইত্যাদি।

কেন হয় এ যন্ত্রণা?

ADHD রোগটির কারণ একেবারে নির্দিষ্ট করে বোঝা যায়নি। তবে কতগুলি কার্যকারণ সম্পর্ক পাওয়া গেছে। বাচ্চার জন্ম যদি নির্দিষ্ট সময়ের (৩৭ সপ্তার) আগে হয় বা জন্মের সময় বাচ্চার ওজন যদি কম হয়। মায়ের গর্ভে থাকার সময় বা পরে মস্তিষ্কে যদি আঘাত হয়। গর্ভবতী অবস্থায় মা যদি সিগারেট মদ খান বা মায়ের যদি কোনো ইনফেকশান হয়। ব্রেনের কিছু অংশ এবং কিছু রাসায়নিক পদার্থ ঠিকমতো কাজ না করার জন্যও এই সমস্যা হতে পারে। ডোপামিন এরকম একটা রাসায়নিক পদার্থ। এছাড়া বাবা মায়ের ADHD থাকলে জিনগত কারণে রোগটি হওয়ার সম্ভবনা বেশি। বাচ্চাকে যদি ছোটোবেলায় সঠিক পরিবেশে বড়ো না করে তোলা হয়, তাকে নিগ্রহ করা হয় তবে এই সমস্যা হতে পারে।

কী হবে সমাধান?

বিদেশে স্কুলে SENCO (Special Educational Needs Co-ordination) বলে একটা পোস্ট আছে। কোনো শিশুর সমস্যা হলে তিনিই রোগটির চিকিৎসার প্রক্রিয়ার দায়িত্ব নেন। প্রয়োজনীয় বিশেষজ্ঞ পরামর্শ নেওয়ান। আমাদের দেশে খুব কম স্কুলে এই ব্যবস্থা আছে। তাই বাবা মা বা স্কুলের শিক্ষক যাঁরাই বাচ্চাটির সমস্যা বুঝতে পারেন—তাঁদের প্রয়োজনে মনোবিদ, মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার (সাইকিয়াট্রিস্ট), স্পেশাল এডুকেটর, পুনর্বাসন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে।

সাধারণত চিকিৎসা দু-ভাবে করা হয়।

১. ওষুধ দিয়ে ও ২. মনশ্চিকিৎসা।

১. ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা—ADHD-র চিকিৎসায় বেশ কিছু ওষুধ ব্যবহার করা হয়। মূলত স্টিমুলেন্ট বা উদ্দীপনাকারী ওষুধ ব্যবহার করা হয়। যেমন মিথাইল ফেনিডেট (Methylphenidate), ডেক্সামফিটামিন (Dexamfetamine), লিসডেক্সাফেটামিন (Lisdexamfetamine)—এই ওষুধগুলিকে স্টিমুলেন্ট বা উদ্দীপনাকারী ওষুধ বলে। এরা ব্রেনের মনোযোগ বাড়ানোর অংশগুলিকে উদ্দীপ্ত করে উপসর্গের উপশম করে। এই ওষুধগুলির নানারকম পার্শ্বক্রিয়া আছে—যেমন হার্টরেট ও প্রেশার বাড়া, খাওয়া কমা, ওজন ও ঘুম কমা। অনেক ক্ষেত্রে মাথা ব্যথা, মেজাজ খারাপ হওয়া, ডায়রিয়া হয়। এছাড়াও আছে অ্যাটোমক্সেটিন (Atomoxetine) এবং গুরানফেসিন (Guranfacine)—এরা ননস্টিমুলেন্ট। এদেরও প্রায় একই ধরনের পার্শ্বক্রিয়া আছে। ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ খাওয়া যাবে না।

২. মনশ্চিকিৎসা—মনশ্চিকিৎসা বিভিন্নভাবে হয়। বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ দ্বারা হয়। মনোবিদ (Psychologist), বিশেষ শিক্ষক (Special Educator), পুনর্বাসন বিশেষজ্ঞ (Rehabilitation Therapist)—সকলেই ADHD-র চিকিৎসা করেন। প্রয়োজনে একাধিক বিশেষজ্ঞের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে করতে হয়।

চিকিৎসা যার দ্বারাই হোক ADHD বাচ্চার বাবা-মা-কে কয়েকটি জিনিস করতে হবে। প্রথমত রোগটি সম্পর্ক ধারণা পরিষ্কার করতে হবে। মনে রাখতে হবে শিশুটি কেবলমাত্র বদমায়েশি করে না সে তার আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না বলেই এই ধরনের সমস্যা করে। তাই যখন সে নির্দেশমতো একটা সঠিক আচরণ করে—ধরা যাক একজায়গায় ১০ মিনিট চুপ করে বসে থাকল, তখন তাকে প্রশংসা করা, ভালোবাসা দেখানো বা ছোটোখাটো পুরস্কার দেওয়া—লজেন্স, বিস্কুট ইত্যাদি যা সে ভালোবাসে। আর যদি সে নির্দিষ্ট আচরণ না করে অস্বাভাবিক কিছু করে তবে তার কোনো একটা অধিকার সাময়িকভাবে কেড়ে নিতে হবে।

বাচ্চাকে সবসময় সুনির্দিষ্টভাবে নির্দেশ দিতে হবে। যেমন তোমার এখনকার কাজ করে নাও। আর সেটা সঠিক করলে তাকে 'এর জন্য ধন্যবাদ' না বলে বলতে হবে 'স্কুল ড্রেস পরার জন্যে ধন্যবাদ' অর্থাৎ নির্দিষ্ট যে কাজ সে করেছে সেটা উল্লেখ করতে হবে। একটা বড়ো কাজকে ছোটোছোটোভাবে ভেঙে দিতে হবে। যেমন সকালে স্কুলে যাওয়ার প্রস্তুতিকে—ব্রাশ করা, টয়লেট ও স্নান করা, স্কুলের ব্যাগ গোছানো, ড্রেস করা, খাওয়া ইত্যাদি। কাজের ওপর নজর রাখতে হবে এবং ঠিক করলে প্রশংসা করতে হবে।

দিনের মধ্যে কিছুটা সময় খেলাধুলো বা শারীরিক কসরত করতে হবে। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে বা সামাজিক মেলামেশার সময়টা সংক্ষিপ্ত রাখতে হবে। বেশিক্ষণ বেশি লোকের সঙ্গে মিশলে অনেক ক্ষেত্রে উত্তেজনা বাড়ে। কোনো খাবার খেয়ে যদি চঞ্চলতা বাড়ে তবে সে খাবার খাওয়া বন্ধ রাখতে হবে।

শেষের কথা

ADHD রোগটা শতকরা ২-৫ জন পর্যন্ত স্কুলের বাচ্চাদের হয়। তাই একে গুরুত্ব দিতে হবে। সঠিক চিকিৎসা অনেককেই একটা সুন্দর ভবিষ্যৎ তৈরি করে দেয়। তা না হলে গল্পের রাজার মতো বিষণ্ণ জীবন অপেক্ষা করে। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. সুমিত দাশ, এমবিবিএস, ডিপিএম, মনোরোগ বিশেষজ্ঞ। প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন। শ্রমজীবী মানুষদের জন্য তৈরি একটি ক্লিনিকের সঙ্গে যুক্ত আছেন।

নবজাতকের মাথায় খুশকি

জন্মানোর পরপরই অনেক বাচ্চার মাথায় হলদেটে, তেলতেলে খুশকি দেখা যায়। ইংরাজিতে বলে Cradle Cap। এটা নিয়ে মা-বাবারা খুব চিন্তিত হন। এটা কী, আর কী করা উচিত, ব্রিটেনের সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থার (NHS) ওয়েবসাইটের সাহায্য নিয়ে লিখেছেন **ডা. জয়ন্ত দাস।**

জন্মানোর পরেই বাচ্চার মাথায় খুশকি অনেক বাচ্চারই হয়। এটা ক্ষতিকর কিছু নয়, আর এতে বাচ্চা কোনোরকম কষ্টও পায় না। কিন্তু মা-বাবা ঠাকমা-দিদিমা এঁরা অনেক সময় ঘাবড়ে যান। কেউ ডাক্তারের কাছে দৌড়ে আসেন, কেউ বা খুঁটে খুঁটে সেগুলো মাথা থেকে তোলেন। মাথা থেকে এই খুশকি তোলার চেষ্ট করতে গিয়ে নরম চামড়া আহত হয়ে সংক্রমণ হতে পারে, তখনই ক্ষতি হয়।

অনেকের ধারণা এটা ছোঁয়াচে রোগ, তা কিন্তু নয়। আবার অনেক ভাবেন, এটা হল বাচ্চাকে অপরিচ্ছন্ন রাখার ফল, সেটাও ভুল ধারণা। আর কথায় কথায় যেকোনো চামড়ার রোগকে অ্যালার্জি আখ্যা দেবার প্রবণতা তো আমাদের আছেই, ফলে এটা লাগাবে না ওটা খাবে না—এমন ফতোয়াও শুরু হয়—সবই অকারণে।

জীবনের প্রথম দু-মাসের মধ্যে এইধরনের খুশকি দেখা যায়, আর কয়েক সপ্তাহ থেকে কয়েক মাসের মধ্যে এটা নিজে থেকেই সেরে যায়। কিন্তু নানারকম 'চিকিৎসা' অনেকসময়ই চলে, তাই শেষমেশ অনেকেরই ধারণা হয় যে সেসব চিকিৎসার ফলেই রোগ সারল।

নবজাতকের এই খুশকি দেখতে কেমন?

একে শনাক্ত করা মোটেই শক্ত নয়। মাথা থেকে আঁশ ওঠে, আর তারপর সেই জায়গার চামড়াকে লাল দেখায়। কোনো কোনো সময় আঁশের সঙ্গে চুল ওঠে, কিন্তু সেখানে চুল আবার গজায়, চিরকালের মতো টাক পড়ে না।

আর মাথাতে মূল আক্রমণ হলেও, মুখ, কান, ঘাড় ও গলা, বগল, এমনকী হাঁটুর পেছনে ও পায়খানা-প্রস্রাবের দ্বারের আশেপাশেও এটা হতে পারে।

এর চিকিৎসা?

সাধারণত এটা কয়েক সপ্তাহ থেকে কয়েক মাস পরে এমনিতেই সেরে যায়, তাই চিকিৎসার কোনো প্রয়োজন নেই। তবে মাথায় বেশি খুশকি জমলে দেখতে যেন কেমন কেমন লাগে, সেজন্য কয়েকটা সাধারণ পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে। বাচ্চাদের শ্যাম্পু দিয়ে মাথা ধোয়ানো, তারপর নরম ব্রাশ দিয়ে আঁশগুলো আলগা করে ঝেড়ে ফেলা। কেউ কেউ শ্যাম্পু করার আগে বাচ্চাদের মাথার তেল দিয়ে আঁশগুলো কিছুক্ষণ একটু নরম করে, তারপর ব্রাশ করে, তারপর শ্যাম্পু করান—তাতে কোনো অসুবিধা নেই।

- কেউ কেউ অলিভ তেল, বা নারকেল তেল বা সাদা পেট্রোলিয়াম জেলি মাথায় আগের দিন রাত্রে লাগিয়ে দিয়ে, সারারাত আঁশগুলো নরম করে, সকালে ব্রাশ করে কিছু আঁশ সরিয়ে দিয়ে তারপর শ্যাম্পু করান—তাতেও কোনো অসুবিধা নেই।
- কিন্তু জোরে ঘষা, বা শক্ত চিরুনি দিয়ে যে করে হোক সব আঁশ তুলে ফেলার চেষ্টা—এগুলো করবেন না।

এর জন্য সাধারণভাবে ডাক্তার দেখানোর দরকার নেই। কিন্তু এর ওপর সংক্রমণ হতে পারে, বিশেষ করে বেশি ঘষাঘষি করলে—তখন ডাক্তার দেখাতে হবে। কোথাও ফুলে গেলে, বা নানা জায়গায় এগুলো ছড়িয়ে পড়লে, ডাক্তার দেখান।

আরেকটা প্রয়োজনীয় কথা। অনেকে বাচ্চার মাথায় বড়োদের খুশকি সারানোর শ্যাম্পু লাগান। তাতে কাজ হয় ঠিকই, কিন্তু চোখে গেলে খুব অসুবিধা। তাই এমনটা করতে উপদেশ দেওয়া হয় না।

কখন ডাক্তার দেখাবেন?

- যদি বাচ্চা এটা সত্যি চুলকায়
- যদি কোথাও ফুলে যায়
- রক্তপাত হয়
- মুখে বা অন্য অনেক জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে।

এর কারণ কী?

এত সাধারণ জিনিস, অথচ এখনও এর কারণ ভালোভাবে জানা নেই। কিন্তু কতগুলো ব্যাপারের সঙ্গে এরকম খুশকির যোগ আছে। সেগুলো হল বেশি তৈলাক্ত মাথা (অর্থাৎ মাথা থেকে সিবাম নামক তৈলাক্ত পদার্থ যদি বেশি বেরোয়), আর মালাসেজিয়া নামক একটি ছত্রাক যা এমনিতেই আমাদের দেহের ওপরে থাকে, তার প্রতি দেহের অতি-সংবেদনশীলতা (চলতি কথায় বললে, ম্যালাসেজিয়া-তে অ্যালার্জি)। ডাক্তাররা এই খুশকিকে বড়োদের খুশকির সব থেকে সাধারণ কারণ সেবোরিক ডার্মাটাইটিস-এর এক গোত্রের ভাবেন।

ঋণস্বীকার: ব্রিটেনের জাতীয় স্বাস্থ্য পরিষবা (NHS) এর ওয়েবসাইট https://www.nhs.uk/conditions/cradle- cap/ স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. জয়ন্ত দাস, এমবিবিএস, এমডি, চর্মরোগবিশেষজ্ঞ। প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন।

১৯৭৯-র ডিসেম্বরে দল্লিরাজহরার ভিলাই স্টিল প্ল্যান্ট হাসপাতালে চিকিৎসক ও সেবিকাদের অবহেলায় প্রাণ হারান লোহা-খনির ঠিকাদারি শ্রমিক কুসুমবাই। প্রসূতি কুসুমবাই ছত্তিশগড় মাইন্স শ্রমিক সংঘের উপাধ্যক্ষা ছিলেন। কুসুমবাইয়ের মৃত্যুতে শ্রমিকরা শপথ নেন নিজেদের এক মাতৃসদন গড়ে তোলার। শেষে মাতৃসদন নয়, গড়ে ওঠে শহীদ হাসপাতাল। আর এক বিশাল জনস্বাস্থ্য আন্দোলন।

কুসুমবাই-সন্দীপ্তাকে মনে রেখে

মেয়েদের স্বাস্থ্যভুবন

ঠিক ৩৩ বছর পর ২০১২-এর ২ ডিসেম্বর চিকিৎসকদের অবহেলায় প্রাণ যায় সাংবাদিক সন্দীপ্তা চ্যাটার্জীর। “সন্দীপ্তাকে মনে রেখে” মহিলাদের স্বাস্থ্যসচেতনতার এক প্রয়াস।

কুসুমবাই ও সন্দীপ্তা যেন এক সূত্রে বাঁধা। তাই *স্বাস্থ্যের বৃত্তে* পত্রিকায় কুসুমবাই-সন্দীপ্তাকে মনে রেখে “মেয়েদের স্বাস্থ্য ভুবন”।

বালবিধবা থেকে মহিলা ডাক্তার
ডা. হৈমবতী সেন-এর দিনলিপি থেকে

পর্ব বারো

প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়

‘ডা. হৈমবতী সেন-এর (১৮৬৬-১৯৩৩) দিনলিপি থেকে’ পঞ্চম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা (এপ্রিল-মে,২০১৬) থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। সংসার-সমাজ-প্রশাসন-সহ প্রায় এক সার্বিক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে হৈমবতীর একক-সংগ্রামকে অনুধাবন করতে গেলে তাঁর সময়কাল, পরিপার্শ্ব, সমাজ-সংস্কৃতিকেও খুঁটিয়ে জানতে হয়। সে কারণে দিনলিপির অনেক-আপাত-সম্পর্কহীন খুঁটিনাটি বিবরণও যথাসম্ভব এ-লেখায় রেখে দেওয়ার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

মহিম দাস আমাদের প্রধান জমিদারি-সেরেস্তার নায়েব ছিলেন। জেঠিমা তাঁরই স্ত্রী। একটু সেকেলে কিন্তু ভারী খোলামেলা সরল মনের মানুষ। সারাদিন নিজের রান্নাবান্না আর ঘর-গেরস্থালির কাজে ডুবে থাকতেন। কার কোথায় কী হচ্ছে-না হচ্ছে; ওসব নিয়ে মাথা ঘামানোর তাঁর একটুও সময় ছিল না। এই মানুষটি আমার অমন দুঃসময়ে আমাকে অনেক আদর-যত্ন করেছেন। আমার বিপদের দিনে যাঁরাই আমাকে কিছুমাত্র সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের প্রত্যেকের কথা চিরদিনের জন্যে আমার মনের মধ্যে গেঁথে আছে।

শুনলাম, সেদিনই বিকেলে গ্রামের মুরুব্বিরা এক জায়গায় জড়ো হয়ে এক সালিশি সভা বসিয়েছে। সেখানে তলব করা হল আমার ভাইকে। সকলে মিলে ওকে যা-নয়-তাই দু-পাঁচ কথা শুনিয়ে দিলেন। সকলেই জোর দিয়ে বললেন: আমার গয়নাগাটি আর টাকাপয়সা ফেরত দিয়ে দিতে। বুঝতেই পারলাম, এসবের পেছনে কলকাঠি নাড়ছেন আমার কাকা। কিন্তু হতভাগা ভাইটার তো ভাঁড়ে মা ভবানী। আর জমিদারি থেকেও কিছু আদায় করার উপায় নেই—মামলা-মোকদ্দমায় ফেঁসে গিয়ে ওর হাত-পা বাধা। সকলের সামনেই ও এই কথাগুলো বলে ফেলল। তখন সকলে মিলে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করলেন। হিসেব করে আমার গয়নাগাটির মোট মূল্য ধরলেন পাঁচ হাজার টাকা। ওকে দিয়ে একটি তমসুক (চুক্তিপত্র) সই করিয়ে নিলেন; আর প্রায় জোর করে আমার একজোড়া বালা ওর থেকে ছিনিয়ে নিলেন।

আমার সঙ্গে ছিল একজোড়া শাল, একটা সিল্কের শাড়ি আর অল্প কয়েকটা থালাবাসন। এগুলো বিক্রি করে দেওয়া হল। বিনিময়ে আমি পেলাম একশো তিরিশ টাকা। আমি আমার গলার হার আর ছোটো দুটো চূড় আমার বোনকে দিয়েছিলাম পরবার জন্যে। আমি ওকে পায়ের মল আর হাতের মানতাসা গড়িয়ে দিয়েছিলাম। এগুলো আমি আর বিক্রি করতে পারলাম না; ওকে একেবারেই দিয়ে দিলাম। মা-হারা মেয়েটার মনে কষ্ট দিতে আমার মন একেবারেই সায় দিচ্ছিল না। ঠিক করলাম, ভগবান আমাকে যেখানে যেমন অবস্থায় ফেলবেন, তাই মেনে নেব। তাঁর ইচ্ছেমতোই জীবন সাগরে ভেসে বেড়াব।

আমি তমসুকটা সঙ্গে নিয়ে ঠাকুর প্রণাম করে পূর্ণকাকা আর মিত্রদাদার সঙ্গে বড়ো ভাশুরের বাড়িতে গেলাম। সেখানে স্বাগত জানানোর বদলে যেভাবে আমাকে পায়ে ঠেলা হল তা মুখে আনা যায় না। মেজো ভাশুর বললেন: ‘যখন বাঁশঝাড় সমূলে উপড়ে যায়, তখন একটা কোঁড় টিকে থাকলে কী লাভ? বাপের বাড়ি গেলে, ভাইকে তো যথাসর্বস্ব দিয়ে এলে। এখন আবার নির্লজ্জ-বেহায়ার মতো এখানে এসেছ কেন?’ আমি বললাম: ‘আপনারা না চাইলে আমি এখানে

থাকব না। কিন্তু আমার বিষয়-আশয়ের ভাগ থেকে আমাকে দশ টাকা করে মাসোহারা দিতে হবে। আমি বেনারসে গিয়ে থাকব। আমার খুব খারাপ দশা চলছে, ভয়ানক দুর্দশায় পড়েছি বলেই তো আপনাদের শরণ নিতে বাধ্য নিয়েছি।'

একথা শোনার পর তিনি কিঞ্চিৎ নরম হলেন বললেন: 'ঠিক আছে, তুমি মাসে মাসে দশ টাকা করেই পাবে।' আমি তখন পূর্ণকাকাকে বললাম: 'চলুন, আমাকে জ্ঞাতি পান্নাবাবুর বাড়ি নিয়ে চলুন।' পূর্ণকাকা ঘাড় নাড়লেন, বললেন: 'অত দূরে আমি যেতে পারব না।' চোখে জল নিয়ে আমি মিত্রদাদার হাত ধরে কাকুতিমিনতি করতে লাগলাম: 'দাদা চলুন না, আমাকে একটু বেনারস নিয়ে চলুন।' তিনি নিমরাজি হলেন। পরদিন আমরা রাজমহল হয়ে গয়ার দিকে রওনা দিলাম। যখন চলে আসছিলাম, ভাশুর আমার হাতে কুড়ি টাকা গুঁজে দিয়েছিলেন। গয়ায় আমার মা-বাবা, শাশুড়ি আর গলায়-দড়ি-দেওয়া ভাইয়ের বউয়ের পিণ্ডি দিতে তিরিশ টাকা খরচ করতে হয়েছিল।

* * *

বেনারস

আমি গয়া থেকে বেনারসে পৌঁছে সোজা গেলাম পুলিনবাবুর বাড়ি। আমার জ্ঞাতি বোন পান্নাদিদির স্বামী। আমি তাঁকে খোলাখুলি আমার সব কথা জানালাম। তিনি আমাকে ভরসা দিলেন: 'আরে অত ভাবছ কেন? তুমি আমাদের বাড়িতেই থাকো কি খুড়িমার বাড়িতে, আমি তোমায় মাসে মাসে বিশ টাকা করে দেব।' মনে হল যেন আকাশ থেকে

'লোকে তো বলবে, তোমার জ্ঞাতি-কুটুমের রক্ষিতা হয়ে এখানে থাকতে এয়েচ। আর কে জানে, তোমাদের দু-জনের মধ্যে কী আশনাই তোমরা বাধিয়েছ? বেনারসের লোকেদের সবারই তো চালচলন, হাবভাব অমনধারা।'

খসে পড়ে চাঁদ আমার হাতে এল। ভাবলাম: 'শেষ অব্দি ভগবান আমার দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন।' কিন্তু তখন যদি জানতাম, নিয়তি আমায় নিয়ে ভবিষ্যতে কী খেলা খেলবে—ঘুণাক্ষরেও আমি তা টের পাইনি। সীতানাথবাবুর ছেলে আর রতনবাবুর ভাগনে, পুলিনবাবু নড়াইলের জমিদার। তিনি আমার জ্ঞাতিবোন পান্নাদিদিকে বিয়ে করেছেন।

আমার বাবা-ই পান্নাদিদিকে বিয়েতে সম্প্রদান করেছিলেন। পিসি কোনোদিন তাঁর শ্বশুরবাড়ির ঘর করেননি। সীতানাথবাবু, পিসিকে বিয়ের সুবাদে আমার পিসেমশাই, ছিলেন কলকাতার ঠনঠনিয়ার বিখ্যাত বসু পরিবারের এক প্রতাপান্বিত কর্তাব্যক্তি। কিন্তু থাকতেন আমাদের বাড়িতে ঘরজামাই হয়ে। আমার বাবা ওঁদের বিয়েতে পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ করেছিলেন। আর তাঁরই মেয়ে আমি কুটুম-বাড়ির দরজায় ভিক্ষাপাত্র হাতে। লজ্জায়, অপমানে মাটিতে মিশে যাচ্ছিলাম। ভগবান যতটুকু দিচ্ছেন তা মাথা পেতে নেওয়া ছাড়া আমি আর কী করতে পারি!

পান্নাদিদি এখন আর বেঁচে নেই। তাঁর স্বামী দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছেন। এই বউকেও আমরা নিজের দিদির মতো ভক্তি করি, ভালোবাসি। পুজোর সময় আগের মতোই রীতিমাফিক উপহার পাঠানো হত। কোনোদিন তার ব্যত্যয় হয়নি। আমার কুটুমের নতুন বউ আমাকে ঘরে তলব করলেন। এর আগে তিনি আমাকে কোনোদিন দেখেননি। আমাকে দেখার পর তার মুখটা কেমন গোমড়া হয়ে গেল। বললেন: 'অঃ! তুমি-ই সেই মেয়ে, বেনারসে থাকতে এয়েচ!' আমি জবাব দিলাম: 'হ্যাঁ।' তিনি বললেন: 'তোমার তো এখন উঠতি বয়স, চেহারাটিও ডাগর-ডোগর। তো এক বুক যৌবন নিয়ে এই ভরা বয়সে বেনারসেই এলে কেন থাকতে?' আমি জবাব দিলাম: 'এসেছি, কেননা আর কোথাও আমার যাওয়ার জায়গা নেই।' তিনি গলায় একইরকম ঝাঁঝ মিশিয়ে বললেন: 'তার মানে তুমি তোমার কুটুমের গলগ্রহ হয়ে থাকতে চাও! কেন, বলো তো? তুমি কি ভুলে গেছ, তোমার জ্ঞাতিবোন মারা গেছেন বেশ কিছুদিন আগেই! তুমি একে বিধবা তায় অমন সোমত্ত চেহারা, ভরা-বয়সের ডানাকাটা পরি! পাঁচজনা কী বলবে বলো তো?' তাঁর এই তীব্র শ্লেষমেশানো কথায় আমি যেন মাটিতে মিশে যাচ্ছিলাম; মাথা নীচু করে চুপটি করে বসে রইলাম। তিনি না থেমে একটানা বলেই যেতে লাগলেন: 'লোকে তো বলবে, তোমার জ্ঞাতি-কুটুমের রক্ষিতা হয়ে এখানে থাকতে এয়েচ। আর কে জানে, তোমাদের দু-জনের মধ্যে কী আশনাই তোমরা বাধিয়েছ? বেনারসের লোকেদের সবারই তো চালচলন, হাবভাব অমনধারা।' এমন নোংরা ইঙ্গিতে, অপমানে আমার দেহ-মন-অন্তরাত্মা পর্যন্ত কেঁপে উঠল; অনেক করেও চোখের জল আটকে রাখতে পারলাম না। রাগে ভেতরটা যেন খাঁ খাঁ করে জ্বলতে লাগল। অপমানের চাবুকের ঘায়ে সারা শরীর যেন জ্বলতে লাগল। আমি তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালাম। তিনি বললেন: 'আরে! চলে যাচ্ছ নাকি? যা হোক কিছু একটা মুখে তুলবে তো নাকি; কিছু না খেলে গেরস্থের যে অকল্যাণ হবে!' আমি বললাম: 'না।'

আমি ও-বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে আমার জ্ঞাতিকুটুমের পুরুতঠাকুরের বউকে চিৎকার করে ডাকলাম: 'খুড়িমা।' তিনি বেরিয়ে এলেন, আর আমার দিকে চেয়ে রইলেন হাঁ করে—তাঁর চাউনিতে ফুটে উঠেছিল এক অবাক-করা বিহ্বলতা। আর পারলাম না, কান্নায় ভেঙে পড়ে তাঁকে সজোরে জড়িয়ে ধরলাম, বললাম: 'আজ থেকে তুমিই আমার মা; কিছু একটা করো আমার জন্যে। এ-বাড়িতে আমি আর এক মুহূর্তও থাকতে পারব না।' তিনি বললেন: 'এরই মধ্যে কী হল তোমার? এই সেদিনই তো বাবু তোমার এই দুর্ভাগ্যের কথা বলতে বলতে কেঁদে ভাসাচ্ছিলেন।' আমি বললাম: 'কাঁদুন, তিনি যত ইচ্ছা

কাঁদুন।' তারপর ওঁকে সব খুলে বললাম—যা যা জ্ঞাতিকুটুমের বউ আমাকে বলেছে। এসব শুনে এতটাই ঘা খেয়েছিলেন খুড়িমা, যে কিছুক্ষণের জন্যে মুখে কোনো কথা সরছিল না। 'কী ভয়ংকর! অমন নোংরা নোংরা কথা ও তোমাকে শোনাতে পারল! কী ঘেন্না! কী ঘেন্না! ও কি কোনো নীচু জাতের মেয়ে, যে অমন বিচ্ছিরিভাবে কথা কয়! ঠিক আছে বাছা, চলে এসো, এখানে আর তোমার এক মুহূর্তও থাকতে হবে না। এক ভদ্র পরিবারের সন্তানকে এরকম বিচ্ছিরিভাবে কেউ অপমান করে কী করে? ছিঃ! ছিঃ! আমি এক্ষুনি গিয়ে তোমার জন্যে একটা ঘর জোগাড় করছি। তুমি পরে বাবুকে জানিয়ে দিতে পারো।' পুলিনবাবু পুরুতঠাকুরের বউকে দু-টাকা করে মাসোহারা দিতেন, আর একটা ঘর দিয়েছিলেন থাকবার জন্যে। আমি সেই ঘরে শুয়ে অঝোরে কাঁদতে লাগলাম।

হে ভগবান! সকলে মিলে আমাকে হামানদিস্তায় পিষুক—এই কি তুমি চাও? একটা তুচ্ছ প্রাণী আমি, এত হেনস্থা কি আমার সয়? আর সয় না। হে করুণাময় ঈশ্বর, তুমি আমাকে তোমার কোলে টেনে নাও। কী পাপ করেছি আমি—জানি না। কিন্তু অন্তর্যামী তুমি তো জানো। সারা জীবন ধরে তুমি আমার সঙ্গে কী নির্মম পরিহাস করে চলেছ! অকারণে এত শাস্তি কি আমার পাওনা? যেখানেই একটু মাথা গোঁজার ঠাঁইয়ের জন্যে ছুটে গেছি সেখানেই তুমি বিশাল বাধার পাঁচিল তুলে দিয়েছ। কী করি আমি এখন? শুয়ে শুয়ে এইসব ভাবনাই মাথায় ঘুরছিল।

খুড়িমা আমার একটা আস্তানার জোগাড় করে বাড়ি ফিরে এলেন। দোতলায় একটি ঘর। যে পরিবার বাড়িটির মালিক, তাঁরা আমাদের দেশের লোক, মানুষ ভালো। মালকিনের নাম সৌদামিনী দেবী, খুলনায় আমাদের মোক্তারের* বিধবা। এক বোন আর এক ভাশুরঝি তাঁর সঙ্গে থাকে। নীচের তলায় থাকে এক ব্রাহ্মণ পরিবার। সে পরিবারের কর্তা অমরনাথ কাঞ্জিলাল। এইসব লোকজনের মাঝে একমাত্র ভগবানের স্মরণ নিয়ে আমি থাকতে শুরু করলাম। পুলিনবাবুকে চিঠি লিখলাম: 'আপনার সহৃদয়তার জন্যে আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু মানসম্মান বিসর্জন দিয়ে আপনার দয়াদাক্ষিণ্য নিতে আমি ঠিক পেরে উঠব না। সেজন্যে নিচ্ছি না। আমাকে মার্জনা করবেন ও মনে কোনো ক্ষোভ পুষে রাখবেন না। অনুগ্রহ করে চিঠিটি আপনার স্ত্রীকে দেখাবেন।' চিঠিটি পেয়ে আমার জ্ঞাতিবোনের স্বামী বিমর্ষ হয়ে পড়লেন। মন্তব্য করলেন: 'আরে ও একটা বড়ো ঘরের মেয়ে। ওদের বংশগৌরব কি কিছু কম কথা! বিছের মতো ও শেষ অব্দি লড়ে যাবে; হুল ফুটিয়ে যাবে—তাতে যদি মরতেও হয়, তাই সই। এত বিপাকে পড়েও ওর আত্মাভিমান এক রত্তিও টসকায়নি।' খুড়িমা ফিরে এসে আমাকে এইসব কথা জানালেন।

ভাশুর সে-মাসে আমাকে দশ টাকা পাঠিয়েছিলেন। সব খরচাপাতি সেরে আমার হাতে দু-তিন টাকা রয়ে গেল। খুড়িমাকে বললাম: 'ভাড়া মিটিয়ে যা বাঁচে তা দিয়ে কিছু চাল আর নুন কিনে আনব। কপালে যদি এর থেকে ভালো কিছু জোটে তো ভালো; না জোটে তো পরোয়া নেই। খুড়িমা আমার কথামতো সব করে দিলেন। আমার সঙ্গে রাতে শুতে ওঁকে অনুরোধ জানালাম। তিনি বললেন, বাবুকে জিগেস করতে হবে; তোমাকে পরে জানাচ্ছি। আমার জ্ঞাতিবোনের স্বামী ওঁকে আমার সঙ্গে থাকার অনুমতি দিলেন। তিনি রোজই সন্ধ্যে হলে হালকা কিছু খাবার-দাবার খেয়ে শুয়ে পড়তেন। রোজই আমায় জিগেস করতেন: 'বাছা, এই সময়টা তুমি কিছুই খাও না কেন বলো তো? চিঁড়ে-মুড়ি-নাড়ু যাহোক কিছু একটা খেলে তো পারো।' জবাব দিই: 'না, আমার খিদে পায়নি।' কিন্তু সত্যি কথাটা হল: খিদের জ্বালায় আমি সারা রাত ঘুমোতে পারি না। খুড়িমা ঠিক টের পেলেন, আমার কাছে টাকাপয়সা নেই বলে আমি অমন না-খেয়ে থাকি। আমি রোজ এক পয়সার জ্বালানি-কাঠ কিনে তিন-মুঠো চাল নুন দিয়ে ফুটিয়ে নিতাম। ব্যস, ওটাই ছিল আমার সারাদিনের খাওয়া। রাতে কিছু খেতাম না। কেউ জিগেস করলে বলতাম: 'আমি তো একাহারী, একবারই পাক করি।'** মানুষজনের কানে যখন এসব কথা গেল, ওঁরা ধরে নিলেন আমার আধ্যাত্মিক জীবনের চাহিদার সঙ্গে খাপ খাইয়ে আমার রোজকার খাওয়া-দাওয়া ঠিক করি। সেজন্যে ভাত ছাড়া আর কিছুই খাই না। আমাদের মালকিন প্রায়ই বলতেন: 'আমাদের হেম বিশুদ্ধ পূত খাদ্য গ্রহণ করে। তেল-ঘি-র নামগন্ধ নেই, কেবল একমুঠো সেদ্ধ ভাত।' আমি ভাবতাম, লোককে আমার এখনকার ঠিক ঠিক হাল জানিয়ে কি লাভ! আর কেনই বা আমার কাঙাল-দশার কথা হাটের মাঝে বলে বেড়াব? বাকি জীবনটা জুড়ে কেউ কি আমায় কানাকড়ি দিয়ে মদত জোগাতে আসবে? আসবে না।

পাশের বাড়িটি বিশুবাবুর। তাঁর বউদি/শালি ভুবনমোহিনী দেবীর বিপুল সম্পত্তির ভার তাঁর ওপর। বাড়িটির অন্যদিকে জয় মিত্রর প্রতিষ্ঠা করা কালী মন্দির; মন্দিরের পাশের বাড়ির দোতলায় থাকতেন তাঁর ছেলের বউ। তিনি খুব বড়োলোক; তাঁর সঙ্গেও আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল। আমরা বিকেলে সবাই মিলে বোন ভুবনের ঘরে জড়ো হতাম আর তাস খেলতাম। আমার যে কী দুর্দৈব চলছে, সেসব কথা পাঁচ- কান করা আমার মোটেই ভালো লাগত না। অন্যেরা অবিশ্যি লোককে নিজের দুঃখের কথা ইনিয়ে-বিনিয়ে বলতে ভালোবাসে—যদি কোনো দরদিয়া জুটে যায়। ভাশুর দু-তিন মাস দশ টাকা করে পাঠিয়ে দুম করে টাকা পাঠানো বন্ধ করে দিলেন। পড়লাম মহা ফাঁপরে। আমার খরচাপাতি যদিও যৎসামান্য, তবুও ঘর ভাড়াটা তো দিতে হয়; নুন, জ্বালানি কাঠও কিনতে হয়। এর ওপর জল বয়ে আনার ধকল নিতে পারি না তাই মাসে মাসে জলের জন্যে চার আনা করে খরচ করতে হয়। এসব খরচের টাকাপয়সা আসবে কোত্থেকে? আমার কাছে তখনও কয়েকটা সোনার চূড় আর এক জোড়া বালা ছিল সেগুলো আমি খুড়িমার কাছে রেখে এসেছি। আটটা চূড় কুড়ি টাকায় বাঁধা দিয়ে

*মোক্তারের আইনি কোনো ডিগ্রি নেই কিন্তু ওকালতি করার অনুমতিপত্র (license) আছে।

**গোঁড়া হিন্দু-বিধবার খাদ্যগ্রহণের ক্ষেত্রে এরকমই কঠোরতা অবলম্বন করা হয়।

ছ-মাসের ভাড়া চুকিয়ে দিলাম। হাতে রইল মাত্র আটটি টাকা—এ দিয়ে বড়োজোর তিন মাস টানতে পারব।

দিনের বেলা খুড়িমার আমার কাছে আসার অবসর মেলে না, কেননা বাবুর মন্দিরে তাঁর অনেক কাজ পড়ে থাকে। এখন আমার হালটা এইরকম—ঘরে এক দানা চাল নেই, এক কণা নুন নেই। দিনে মাত্র একবার খাব, তা রাঁধার মুরোদও আমার নেই। যখন স্নান করতে যেতাম তখন রাস্তায় ফেলে দেওয়া মাটির গড়া শিব* আর ঠাকুরকে নিবেদন করা কলা কুড়িয়ে নিতাম। ওই কলা খেয়ে আমার খিদে মেটাতাম। আমার এক মাথা ঘন আতেলা রুক্ষ চুল। ভুবনদিদি এসে বলতেন: 'জানি তুমি চুলে তেল দেবে না,** অন্তত একটু মাখনও তো ঘষতে পারো।' জবাব দিতাম: 'আমার খুব মাথা ধরে।' খুড়িমা তখন আত্মীয়-কুটুমদের থেকেও আমার কাছের মানুষ। জগতে তখন ওঁর মতো বন্ধু আমার আর কেউ ছিল না। খুড়িমা আমার পেটে হাত দিয়ে পরখ করে বলতেন: 'মনে হয়, তুমি সবসময় পেটের খিদে চেপে রাখো।' বলতাম: 'কী করব বলো? সবরকম অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারাই কি ভালো নয়? তুমি কী বলো, খুড়িমা।' তাঁর জবাব: 'হক কথা বলেছ বটে, কিন্তু অসুখে পড়লে তখন?' বললাম: 'কী হবে? মরব!'

পড়শিদের মধ্যে কেউ অসুখে পড়লে আমি ছুটে গিয়ে তাঁর সেবাযত্ন করতাম। সেজন্যে সকলেই আমায় ভালোবাসত। মালকিন যখন অসুখে পড়লেন, আমি দিনরাত তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করেছি। একতলার ব্রাহ্মণকে আমি ডাকতাম পিসেমশায়, তাঁর বউকে পিসিমা। একবার ওঁরা দু-জনেই জ্বরে পড়লেন। দিনরাত তাঁদের সেবাযত্ন করে আমারও দম প্রায় ফুরিয়ে আসার দশা। ওঁরা দু-জনে আমাকে নিজেদের মেয়ের মতো ভাবতে শুরু করলেন। যখনই ওঁরা কোনো মন্দির বা সাধু দর্শনে যেতেন, আমাকে সঙ্গে নিতেন। পিসেমশায় রোজ সকালে গীতা* পড়তেন। আমি আর পিসিমা শ্রোতা। যাই হোক, ছ-সাত দিন আমার পেটে কিছু পড়েনি, উপোস দিয়ে আছি। পড়শি ভুবনদিদি একদিন আমায় জোর করে চেপে ধরলেন: 'তোমার কী হয়েছে বলো তো? বলতেই হবে আমাকে।' আমি কিছুতেই বলব না, তিনিও ছাড়বার পাত্রী নন। জেরায় জেরায় আমাকে জেরবার করে দিলেন। শেষে বলতেই হল আমার অবস্থার কথা। তিনি বললেন: 'বোন, আমি তোমার একটা সুরাহা করতেই পারি, কিন্তু করব না; তাহলে অন্যদের চোখে তুমি খাটো হয়ে যাবে। এ-কাজ আমি কিছুতেই করতে পারব না। আমি তোমায় পড়শি হিসেবে চার টাকা ধার দিচ্ছি। নিয়ে নাও, আর গোল কোরো না। এখুনি তোমার যা যা দরকার সেগুলো মিটিয়ে নাও। পরে না হয় আমাকে শোধ দিয়ে দেবে। তোমার এই হাল তো আর চিরকাল থাকবে না।' আমি বললাম: 'আজ নয়,' বলে তাঁকে ফিরিয়ে দিলাম। আমার কাছে এখনও মেজদির একশো টাকা পড়ে আছে। তিনি একজোড়া সোনার বালা বেনারস থেকে কিনে আনার জন্যে আমাকে দিয়েছিলেন। তার এক কপর্দকও আমি খরচ করিনি। মরে গেলেও ও-টাকায় আমি হাত দিতে পারব না। লোকের বিশ্বাস ভাঙা আমার ধাতে সয় না।

(চলবে) স্বাস্থ্যের বৃত্তে

*বিধবারা শিবের যে নিত্য পুজো করতেন, তাতে তাঁরা নিজেরাই মাটি দিয়ে শিবের 'লিঙ্গমূর্তি' গড়ে নিতেন।

**বিধবাদের যতরকম বঞ্চনা সইতে হত, তার একটা নজির: চুলে তেল দিতে পারবে না।

লেখক প্রাবন্ধিক ও অভিধানকার।

Advt.

মিডিয়া কবলমুক্ত, তথ্যনিষ্ঠ বিশ্ব-বিশ্লেষণের ত্রৈমাসিক সম্ভার

বাংলা মান্থলি রিভিউ

স্বাধীন মার্কসবাদ-চর্চার অনন্য পত্রিকা

যোগাযোগ: বই-চিত্র, কলেজ স্ট্রিট, কফিহাউস (তৃতীয় তল), কলকাতা ৭০০০৭৩

মুঠোফোন: ৯৪৭৭৪৩৩৩৫২
৯৮৩০৮৪৭১৫৯

নারী-শিশুর ওপর যৌন নির্যাতন

রুমঝুম ভট্টাচার্য

শিশুদের ওপর যৌন নির্যাতন বা উৎপীড়নের ঘটনা আমাদের অনেকগুলো প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করায়। শিশুর যথাযথ নিরাপত্তার প্রশ্ন, এ-ধরনের অপরাধের কারণ বিষয়ক প্রশ্ন, সর্বোপরি, এর প্রতিরোধ সম্ভব কীভাবে সেই প্রশ্ন। যৌনতা চিরকালই ভারতীয় সমাজে এক ভীষণ গোপন লুকোচুরির বিষয়। শিশু অবস্থায় কোনোভাবে যৌন হেনস্থার শিকার হলে অভিভাবকের কাছে সে কথা প্রকাশ করা মস্ত অপরাধ। যদি বা প্রকাশ করা গেল তার ফলস্বরূপ নির্যাতিতা (এক্ষেত্রে শিশুকন্যা) শিশুটিকেই ভোগ করতে হয় সেই হেনস্থার ফল। অভিভাবক প্রতিবাদ করার বদলে বদনামের ভয়ে শিশুটিকে নজরবন্দি করে রাখার চেষ্টা করেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হরণ করা হয় তার বিভিন্ন স্বাধীনতা। শৈশব হারিয়ে যায় যৌন লালসার শিকার হয়ে।

প্যারাফিলিয়া হল অস্বাভাবিক যৌনাচার, যেখানে আক্রান্ত ব্যক্তির বিশেষ কোনো বস্তু বা শিশুদের বা জন্তু-জানোয়ার দেখলে যৌন উত্তেজনা জাগে বা কোনো বিশেষ কাজ করলে (যেমন, নিজেকে উন্মুক্ত করা বা অন্যকে ব্যথা দেওয়া) যৌন উত্তেজনা হয়।

একটা ঘটনার উল্লেখ করি। কয়েক বছর আগে একটি কিশোরী মেয়ে আসে আমার কাছে সাহায্যের জন্য। মেয়েটি কলকাতার একটি অত্যন্ত নাম করা স্কুলের ছাত্রী ছিল। দক্ষিণ কলকাতার অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে। তার মা বাবা দু-জনেই ইঞ্জিনিয়ার ও চাকরি করেন। মেয়েটির মায়ের সঙ্গে অত্যন্ত তিক্ত সম্পর্ক। সে মায়ের কোনো কথা শুনতে চায় না। ঔদ্ধত্য (Defiance) ও দ্রুত মেজাজ বদলানোর সমস্যার কারণেই সে আমার কাছে চিকিৎসার জন্য আসে। আচরণগত ও আবেগজনিত সমস্যার সমাধানের কারণেই গভীর পর্যালোচনা করে দেখতে পাই মায়ের প্রতি মেয়েটির মনে তীব্র অভিযোগ ও অভিমান কাজ করছে। মেয়েটির সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, ছোটো বয়সে সে যেখানে সাঁতার শিখতে যেত সেই ট্রেনার তাকে ধর্ষণ করে এবং মেয়েটি বাড়িতে সেকথা জানানোর পরে তার অভিভাবক লোক জানাজানির ভয়ে কোনো পুলিশ কেস করেননি। উপরন্তু তাঁর মেয়েটির সাঁতার বন্ধ করে দেন ও অত্যন্ত কড়া পাহারা দিয়ে তার নিরাপত্তা সুরক্ষিত করতে চান। ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে মেয়েটি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ে ও ভেঙে পড়ে। তার শিশুমনে একটা বিরাট ধাক্কা লাগে যে তার সঙ্গে একজন হিংসাত্মক আচরণ করল অথচ সে মানুষটার কোনো শাস্তি হল না, উলটে সাঁতারের প্রতি এত ভালোবাসা সত্ত্বেও তার সাঁতার বন্ধ করে দেওয়া হল।

এই ঘটনা এবং এরকম আরও অনেক অনেক ঘটনা আইনব্যবস্থার অগোচরে থেকে যায়। কারণ যৌন আচরণ সম্বন্ধে আমাদের মনোভাব। অনেক ভুল ধারণা, অনেক অবদমন থেকেই এই ধরনের শাস্তিযোগ্য অপরাধকে বদনামের ভয়ে এড়িয়ে যাওয়া। অপরাধের শিকার হওয়ার গ্লানি বয়ে বেড়ানো শিশু যখন পূর্ণবয়স্ক হয় তখন তার মধ্যে দেখা যেতেই পারে অস্বাভাবিক যৌন আচরণ। এ যেন সেই উত্তর না পাওয়া প্রশ্ন—ডিম আগে না মুরগি আগে? আজ যে পূর্ণবয়স্ক মানুষটি একজন শিশুকে যৌন নির্যাতন করছে তার শিশুকালে সে নিজে এমন অপরাধের শিকার হয়েছে হয়তো।

প্যারাফিলিয়া ও পেডোফিলিয়া

প্যারাফিলিয়া হল অস্বাভাবিক যৌনাচার, যেখানে আক্রান্ত ব্যক্তির বিশেষ কোনো বস্তু বা শিশুদের বা জন্তু-জানোয়ার দেখলে যৌন উত্তেজনা জাগে বা কোনো বিশেষ কাজ করলে (যেমন, নিজেকে উন্মুক্ত করা বা অন্যকে ব্যথা দেওয়া) যৌন উত্তেজনা হয়। সচরাচর প্যারাফিলিয়া মহিলাদের তুলনায় পুরুষদের মধ্যেই বেশি। আর পেডোফিলিয়া হল এক বিশেষ ধরনের প্যারাফিলিয়া যেখানে শিশুর প্রতি যৌন উত্তেজনা জাগে। DSM-5-এ পেডোফিলিয়ার জন্যও তিনটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা আছে:

১. ছয় মাসের বেশি এই লক্ষণ দেখে যেতে হবে।

২. শিশুর শরীর কল্পনা করে বা শিশুর সঙ্গে যৌন আচরণে বারবার তীব্র যৌন উত্তেজনা অনুভূত হলে।

৩. শিশুর বয়স ১৩ বছর বা তার কম হতে হবে।

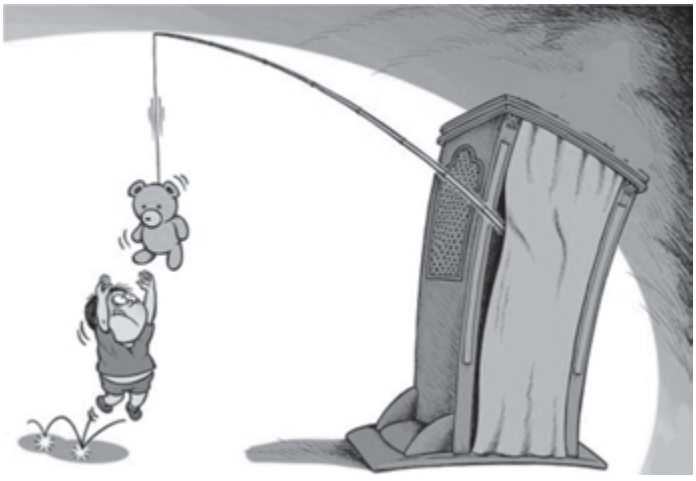

পেডোফিলিয়া যাদের আছে তারা সচরাচর শিশুদের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার কারণে শিশুরা যুক্ত থাকে এমন ক্রিয়াকাণ্ডের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করে। যেমন অ্যাথলেটিক দল বা স্কাউট টিমে। এদের ব্যক্তিত্বে অনেক সময় শিশুদের আকর্ষণ করার বিশেষ ক্ষমতা থাকে এবং সহজেই তারা শিশুর বিশ্বাস অর্জন করতে পারে। কথা হল, পেডোফিলিয়া আছে এমন পূর্ণবয়স্ক মানুষ চিহ্নিত করা একটু শক্ত। কারণ এরা নিজের থেকে কখনোই চিকিৎসার জন্যও এগিয়ে আসে না। কোনো অপ্রিয় ঘটনা ঘটে গেলে কোর্টের অর্ডার অনুযায়ী এদের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা হয়।

যৌনতা নির্ধারক হরমোনঘটিত (Sexual Hormones) সমস্যা থাকলে পেডোফিলিয়া হতে পারে। শিশু অবস্থায় যৌন নির্যাতনের শিকার হলেও এই অস্বাভাবিক যৌনব্যাধি হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে।

শিশু যদি শৈশবে এমন যৌন হেনস্থার শিকার হয়ে বা এমন অপরাধের সাক্ষী হয়ে থাকে তাহলে পরবর্তী জীবনে সে এমন আচরণ অনুকরণের চেষ্টা করতে পারে।

এ তো গেল একধরনের অস্বাভাবিক যৌন আচরণ যার ফলে শিশুরা অনেক সময়ই যৌন নির্যাতনের শিকার হতে পারে।

যারা শিশুদের ওপর যৌন নির্যাতন করে তারা প্রকৃতিগতভাবে দ্বিধান্বিত (Confused), ও চাহিদাপ্রবণ (Impulsive)। তাদের যৌন চাহিদা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা থাকে না। ফলে উপযুক্ত পরিস্থিতিতে পড়লে, এবং শিশু যেহেতু বড়ো মানুষের তুলনায় সহজে প্রভাবিত হয় তাই, নিজের যৌনচাহিদা তৃপ্ত করতে শিশুকেই বেছে নেওয়া সহজ হয় এইসব মানুষদের ক্ষেত্রে।

এই ধরনের ব্যক্তির যুক্তি (rationalization), প্রেষণা (motivation), ও চিন্তনে (thought process) গুরুতর অস্বাভাবিকতা থাকে, কাউন্সেলিং-এর মাধ্যমে যার সংশোধন হওয়া দরকার।

এই ধরনের যৌন অপরাধের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 'Behaviour learning model' অনুযায়ী বলা হয়ে থাকে কোনো শিশু যদি শৈশবে এমন যৌন হেনস্থার শিকার হয়ে বা এমন অপরাধের সাক্ষী হয়ে থাকে তাহলে পরবর্তী জীবনে সে এমন আচরণ অনুকরণের চেষ্টা করতে পারে। এদের অনেকেই 'সুস্থ সামাজিক বা যৌন সম্পর্কে' বঞ্চিত থাকে ফলে অসামাজিক আচরণ করতে শেখে।

নির্যাতিত শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য

একজন শিশু যখন অস্বাভাবিক যৌন আচরণের শিকার হয় তখন সেই ঘটনার দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব থেকে যায় তার জীবনে। এই ঘটনা তার জীবনে একটা আঘাত (trauma)। তার মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা স্বাভাবিকভাবেই অনেক বেড়ে যায়। পৃথিবী নিরাপদ স্থান নয় এবং কোনো মানুষকেই বিশ্বাস করা যায় না—এমন ধারণা তৈরি হয়। নিজের সম্বন্ধে হীনম্মন্যতার ভাব তৈরি হয়। নিজেকে এ-ঘটনার জন্যও দায়ী করার প্রবণতা জমতে পারে। নেতিবাচক মনোভাব তৈরি হওয়ার ফলে অসংযত নেতিবাচক আবেগ বাড়ে। ইম্পালসিভ প্রকৃতি (nature) তৈরি হয় যার জন্যও ভবিষ্যতে ঝুঁকি আছে এমন আচরণ (risk behavior) করার প্রবণতা বাড়ে। ডিপ্রেশনের শিকার হয়ে নিজেকে আঘাত করার মতো আচরণ তৈরি হয়।

উদ্বেগ সংক্রান্ত অসুখ (Anxiety Disorders), অবসাদ (Depression), খাদ্যাভ্যাসের অসুখ (Eating Disorders), পার্সোনালিটি ডিজ়-অর্ডার, নেশাগ্রস্ততা ইত্যাদি ভবিষ্যত জীবনকে করে তোলে অন্ধকার।

প্রতিকার সম্বন্ধে দু-চার কথা

শিশু স্বভাবতই নির্ভরশীল। পূর্ণবয়স্ক মানুষ ও সমাজ তাকে সেই সুরক্ষা দেবে এমনটা হলেই ভালো হত। কিন্তু তা হতে পারে না। তাই শৈশবেই লালসার শিকার হয় শিশু—ঘরে ও বাইরে। সুরক্ষাব্যবস্থা জোরদার করার দাবি ন্যায্য ও সংগত। তবু এককের প্রচেষ্টাই সম্মিলিতের সাধন। যৌনতা সম্বন্ধে মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে হবে। যথোচিত যৌনশিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। নচেৎ ব্যবসায়ের খাতিরে যারা যৌনতাকে ব্যবহার করে সেইসব মাধ্যম দ্বারা ভুল বার্তা মানুষকে বিভ্রান্ত করবেই আর তার ফল ভুগতে হবে দুধের শিশুকেও।

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

লেখক একজন সাইকোলজিস্ট।

জন্মের কতক্ষণ পর শিশুর নাড়ি কাটা উচিত?

গর্ভাবস্থায় ভ্রূণের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় নাড়ি। জন্মের পর মা ও শিশুর নাড়ির যোগ কখন বিচ্ছিন্ন হওয়া উচিত—তা নিয়ে বিতর্ক অনেক। কী করা উচিত তা নিয়ে লিখেছেন **ডা. কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়**।

কথায় বলে নাড়ির যোগ। গর্ভাবস্থায় ফুট দেড়েক লম্বা দড়ির মতো যে অঙ্গটি মা ও ভ্রূণের মধ্যে আবশ্যিক সংযোগ স্থাপন করে, ডাক্তারি পরিভাষায় তাকেই 'আমবিলিক্যাল কর্ড' বা সংক্ষেপে কর্ড বলা হয়। প্রয়োজনীয় পুষ্টির জোগান, রক্ত সংবহন, অক্সিজেন সরবরাহ ইত্যাদি নানা ভূমিকার পাশাপাশি ভ্রূণের শরীর থেকে ব্যবহৃত রক্ত আবার মায়ের শরীরে এনে ফেলাও এই কর্ডটির কাজ। এহেন অবিচ্ছেদ্য জীবনরেখা জন্মের কতক্ষণ পরে বিচ্ছিন্ন করা উচিত তা নিয়ে বিতর্ক অনেক। প্রাণীজগতের দিকে তাকালে বোঝা যায় মাতা-শিশুর এই শারীরিক বিচ্ছেদ প্রাকৃতিক ও অবশ্যম্ভাবী। সামান্য কয়েক মিনিট অপেক্ষা করলেই তো ঘটনাটি ঘটে যায়। কিন্তু বিজ্ঞান বিশ্বাসী মানুষ কী বলেন? এমন ডাক্তারি পাঠ্যপুস্তকের কোনো অভাব নেই যেখানে শিশুজন্মের পরই যথাশীঘ্র সম্ভব কর্ড কাটার (Early Cord Clamping বা ECC) কথা বলা আছে। যদিও তার বিপরীতেও যুক্তি অনেক। গত কয়েক বছর ধরে বিজ্ঞানসম্মত তথ্যের পাল্লা অবশ্য সামান্য দেরিতে কর্ড কাটার (Delayed Cord Clamping বা DCC) দিকেই ভারী। এর ফলে সদ্যোজাতের শরীরে কিছু অতিরিক্ত রক্ত সঞ্চালিত হয় এবং তার আয়রনের অভাবে রক্তাল্পতা (anaemia)-র সম্ভাবনা কমে যায়। অপেক্ষাকৃত কম পরিণত বাচ্চাদের (premature) জন্য এই সামান্য অতিরিক্ত রক্ত আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। গত কয়েক দশকে প্রাপ্ত বিজ্ঞানসম্মত তথ্যের ভিত্তিতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তরফে ২০০৮ সালে DCC সমর্থন করে বিবৃতি প্রকাশিত হয়। স্ত্রীরোগ ও ধাত্রীবিদ্যার বিশ্বের সর্বোচ্চ বিশেষজ্ঞ সংস্থা FIGO-ও ২০০৯ সালে তাদের নির্দেশিকায় দেরি করার রীতিকেই সমর্থন জানায়। প্রভূত যুক্তি থাকা সত্ত্বেও বেশ কিছু ক্ষেত্রে এখনও যথাশীঘ্র সম্ভব কর্ড কেটে ফেলা হয়। কখনো তা মা অথবা শিশুর স্বার্থে। কখনো বা অজ্ঞতায়।

আমবিলিক্যাল কর্ডের গঠন

গর্ভসঞ্চারের পর-মুহূর্ত থেকেই ভ্রূণ গঠনের পাশাপাশি থালার মতো গোলাকৃতি একটি অঙ্গ তৈরি হতে থাকে। ইঞ্চিখানেক পুরু এই অঙ্গের নাম প্ল্যাসেন্টা, যা গর্ভধারিণী মায়ের জরায়ু প্রাচীরে লেপটে থাকে। বাংলায় অনেকে একে 'ফুল' বলে থাকেন। এই প্ল্যাসেন্টা থেকে দেড়-দুই ফুট লম্বা দড়ির মতো একটি অংশ "কর্ড" বেরিয়ে এসে ভ্রূণের নাভিমূলে প্রবেশ করে। তাই এর আরেক নাম নাভিরজ্জু। এই নাভিরজ্জুতে একটি চওড়া শিরা ও দুইটি সরু ধমনি থাকে। শিরা মারফত অক্সিজেন সমৃদ্ধ, উচ্চ পুষ্টিসম্পন্ন রক্ত মায়ের শরীর থেকে

> শুধুমাত্র শিশুর সম্ভাব্য প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে 'লাইফ ইন্সিওরেন্স'-এর মতো এত খরচসাপেক্ষ একটি 'বিমা পলিসি' কেনার কোনো যৌক্তিকতা এই মুহূর্তে নেই।

গর্ভস্থ ভ্রূণের শরীরে চলে যায়। আর ধমনি দু-টি মারফত ব্যবহৃত রক্ত আবার মায়ের সংবহন তন্ত্রে ফিরে আসে। গর্ভাবস্থায় এই কর্ডই হল একমাত্র সাপ্লাই চ্যানেল, ভ্রূণের লাইফলাইন।

ইতিহাস ফিরে দেখা

ECC বনাম DCC বিতর্ক প্রায় দু-হাজার বছরের পুরোনো। এ সম্পর্কে সর্বপ্রাচীন আলোচনা পাওয়া যায় খ্রিস্টজন্মের ৬০০ বছর আগে (Old Testaments, Book of Ezekiel 16:4)। হিপোক্রেটিস খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ সনে শিশুর পুষ্টি রক্ষায় আমবিলিক্যাল কর্ডের অবদানের কথা বর্ণনা করেছিলেন।

মনুসংহিতা-বর্ণিত 'জাতকর্ম' আচারে (Jata Karma Rituals) নবজাতক ভূমিষ্ঠ হবার পর পিতাকে সন্তানের কর্ণে ঈশ্বরের নাম আর

ওষ্ঠে ঘৃত-মধু স্পর্শ করানোর পরামর্শ দেওয়া আছে। 'জাতকর্ম'-এর রীতি অনুযায়ী নাভিরজ্জু কাটার আগেই এই ঘৃত-মধু দেওয়ার কথা। অর্থাৎ পুরাকালেও নাভিরজ্জু তৎক্ষণাৎ কাটার কথা বলা হয়নি। তাহলে ECC একপ্রকার অভ্যেস হয়ে দাঁড়াল কেন সে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক।

বর্তমানে প্রচলিত প্রথা

প্রসবকালকে মূলত তিন ধাপ (stage)-এ ভাগ করা হয়। প্রসব বেদনা ওঠা থেকে জরায়ুমুখ (Cervix) পুরোপুরি খুলে যাওয়াকে বলা হয় প্রথম স্টেজ। এই অবস্থা থেকে শিশু সম্পূর্ণভাবে বেরিয়ে আসা পর্যন্ত সময়কে বলা হয় দ্বিতীয় স্টেজ। আর তার পর থেকে প্ল্যাসেন্টা নিষ্ক্রমণ পর্যন্ত সময়কে বলা হয় তৃতীয় স্টেজ। শত সহস্র বছরের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় এই তৃতীয় স্টেজই হল সেই সময় যখন মায়ের প্রবল রক্তক্ষরণের (Post Partum Haemorrhage বা PPH) সম্ভাবনা থাকে। এই রক্তক্ষরণ বন্ধ না করতে পারার ফলে বিশ্বজুড়ে ফি-বছর অসংখ্য মায়ের প্রাণহানি হয়। অতএব এই সময় চিকিৎসককে মায়ের স্বাস্থ্য রক্ষার দিকে বিশেষ নজর দিতে হয়। জরায়ু সংকুচিত রাখতে পারলে এবং প্ল্যাসেন্টা তাড়াতাড়ি বের করে দিতে পারলে এই রক্তক্ষরণের

তাড়াহুড়ো করে মা-শিশুর শারীরিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করাও এরকমই একটি অভ্যাস বলে ধরে নিতে হয়। কোনো আশু সমস্যা না থাকলে কর্ডের স্পন্দন না থামা পর্যন্ত অতিরিক্ত দু-এক মিনিট অপেক্ষা করাই উচিত। সদ্যোজাত শিশুটির স্বার্থে। একান্তই।

পরিমাণ অনেক কমে যায়। তাই আধুনিক ধাত্রীবিদ্যা প্রাকৃতিক ঘটনাবলির জন্যে অপেক্ষা করার পরিবর্তে সক্রিয় (active) তৃতীয় স্টেজ ম্যানেজমেন্ট-এর পক্ষপাতী। কারণ, এতে মায়ের জীবনের ঝুঁকি কমে। তবে ২০০৮ সালে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী (Cochrane Database of Systematic Reviews, Issue 2) কর্ড ক্ল্যাম্পিং-এর সঙ্গে PPH-এর কোনো সম্পর্ক নেই। এই সব তথ্য মাথায় রেখেই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বিশেষজ্ঞদল DCC সুপারিশ করেন।

দেরি মানে কত দেরি?

বিভিন্ন বিজ্ঞানী-চিকিৎসক মহল এ-ব্যাপারে বিভিন্ন মতামত দেন। কেউ বলেন এক মিনিট, কেউ বা পাঁচ মিনিট। তবে মোদ্দাভাবে দেখতে গেলে কর্ডে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গেলে আর অপেক্ষা করার মানে হয় না। আর সেটি আন্দাজ করা যায় কর্ডের স্পন্দন বা pulsation বন্ধ হয়ে গেলে। এই সময়টুকু অপেক্ষা করাকালীন শিশুর শরীরের তাপমাত্রা স্বাভাবিক কিনা, তার কোনো শ্বাসকষ্ট হচ্ছে কিনা, হৃদ্‌স্পন্দন সঠিক মাত্রার চলছে কিনা ইত্যাদি বিষয়ে খেয়াল রাখতে হয়। একটু এদিক ওদিক হলেই সদ্যোজাতকে উপস্থিত শিশুবিশেষজ্ঞের হাতে তুলে দিতে হয়। Budwin ১৮৭৫ সালে তাঁর পরীক্ষানিরীক্ষায় প্রমাণ করেন যে তাড়াহুড়ো করলে আমরা শিশুটিকে প্রায় বিরানব্বই মিলিলিটার পর্যন্ত অত্যন্ত প্রয়োজনীয় রক্ত থেকে বঞ্চিত করতে পারি। একটি সদ্যোজাতের জন্য এই পরিমাণ রক্ত কিন্তু কার্যত অনেকটাই। সাধারণ রক্তের চেয়ে এর গুণমান অনেক বেশি, কারণ এতে থাকে রোগপ্রতিরোধকারী ইমিউনোগ্লোবিউলিন এবং বহুক্ষমতাসম্পন্ন স্টেমসেল।

দেরিতে কি কোনোই সমস্যা নেই?

দেখা গেছে, যে সমস্ত বাচ্চাদের দেরিতে কর্ড ক্ল্যাম্পিং করা হয় তাদের ক্ষেত্রে জন্ম-পরবর্তী জন্ডিস রোগের ঝুঁকি সামান্য বেশি থাকে। তবে এই ধরনের জন্ডিস শুধুমাত্র আলো-চিকিৎসা প্রয়োগ (phototherapy)-এ সারিয়ে তোলা যায়। ধাত্রীবিদ্যার 'বাইবেল' উইলিয়ামস্ অবস্টেট্রিক্স ১৯৫০-এর সংস্করণেই DCC-র পরামর্শ দেয়। তবে এটি করতে গিয়ে যাতে মায়ের অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ না হয় আর শিশুর শ্বাসকষ্ট না হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে বলে। এই সব সমস্যার বিন্দুমাত্র আঁচ পেলেই চিকিৎসক যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

কর্ড ব্লাড সংরক্ষণের জন্য কি দেরি করা উচিত?

ইদানীং অনেকে কর্ড ব্লাড সংরক্ষণের জন্য অনুরোধ করেন। এটি কতখানি কাজের বা অকাজের সে নিয়ে *স্বাস্থ্যের বৃত্তে* পত্রিকার ফেব্রুয়ারি-মার্চ ২০১৬ সংখ্যায় বিস্তারিত আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে। আমবিলিক্যাল কর্ড ব্লাড হল স্টেমসেলের একটি উচ্চমানের উৎস যা দিয়ে কিছু কিছু ব্লাড ক্যান্সার, থ্যালাসেমিয়া ইত্যাদি রোগের চিকিৎসা হওয়া সম্ভব। পরিবারে এরকম কোনো রোগী না থাকলে শুধুমাত্র শিশুর সম্ভাব্য প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে 'লাইফ ইন্সিওরেন্স'-এর মতো এত খরচসাপেক্ষ একটি 'বিমা পলিসি' কেনার কোনো যৌক্তিকতা এই মুহূর্তে নেই। বেশি পরিমাণে কর্ড ব্লাড সংগ্রহের স্বার্থে তাড়াতাড়ি ক্ল্যাম্পিং তাই একেবারে সমর্থনযোগ্য নয়।

পরিশেষে

দু-শো বছরেরও বেশি সময় ধরে দেরিতে কর্ড ক্ল্যাম্পিং-এর পক্ষে বিভিন্ন তথ্য প্রমাণ উঠে এসেছে তবু এখনও কিছু ক্ষেত্রে সে সুপারিশ মানা হয় না। এটি দুর্ভাগ্যজনক। কিছু কিছু অভ্যাস পরের পর প্রজন্ম ধরে চলতে থাকে। তাড়াহুড়ো করে মা-শিশুর শারীরিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করাও এরকমই একটি অভ্যাস বলে ধরে নিতে হয়। কোনো আশু সমস্যা না থাকলে কর্ডের স্পন্দন না থামা পর্যন্ত অতিরিক্ত দু-এক মিনিট অপেক্ষা করাই উচিত। সদ্যোজাত শিশুটির স্বার্থে। একান্তই।

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা.কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়, এমবিবিএস, এফআরসিওজি, স্ত্রীরোগ ও ধাত্রীবিদ্যা বিশেষজ্ঞ।

স্ত্রী-জননাঙ্গে ছত্রাক সংক্রমণ

ভ্যাজাইনাল থ্রাশ এক অস্বস্তিকর এবং অপ্রীতিকর সমস্যা। অত্যন্ত সাধারণ এই ছত্রাক সংক্রমণ বেশির ভাগ মহিলাকেই কোনো-না-কোনো সময়ে জ্বালাতন করে, অথচ এই সংক্রমণ সঠিক চিকিৎসায় সহজেই নির্মূল করা যায়—NHS-এর প্রচার সামগ্রীর সহায়তায় লিখেছেন **ডা. কুশল সেন**।

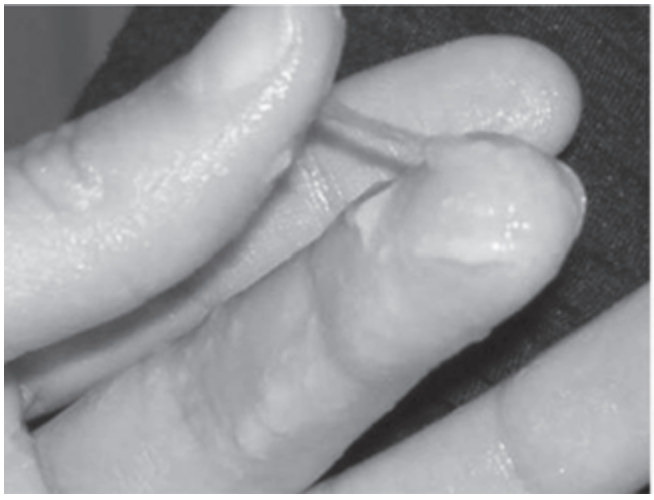

ভ্যাজাইনাল থ্রাশ এক সাধারণ ছত্রাক সংক্রমণ বেশির ভাগ মহিলাই যাতে কোনো-না-কোনো সময়ে ভুগেছেন। সঠিক চিকিৎসায় সহজেই নির্মূল করা যায় এই রোগকে, কিন্তু কিছু মহিলার ক্ষেত্রে সংক্রমণ সারানো কঠিন হয় আর সমস্যা বারে বারে ফিরে আসে।

কখন ভ্যাজাইনাল থ্রাশ সন্দেহ করবেন?

এই রোগের সাধারণ উপসর্গগুলো হল—

- যোনিদ্বারে জ্বালা ও চুলকানি;
- যোনি থেকে গন্ধবিহীন ঘন সাদা বা পাতলা তরল বেরোনো, চলতি কথায় যাকে সাদা স্রাব বলে;
- সঙ্গমের সময় বেদনা (এর ফলে সঙ্গমে ব্যথা হতে পারে);
- মূত্রত্যাগের সময় চিনচিনে ব্যথা হওয়া;
- কখনো যোনির চারপাশের চামড়া লাল হয়ে ফুলে যায় বা ফেটেফেটে যেতে পারে;
- চামড়া ছড়েও যেতে পারে। যদিও এই ছড়ে যাওয়াটা মূলত জননাঙ্গের হারপিস নামক ভাইরাস সংক্রমণের লক্ষণ।

ভ্যাজাইনাল থ্রাশ হলে কী করবেন?

যদি আপনার আগে এই সংক্রমণ হয়ে থাকে আর আবার হয়েছে বলে মনে হচ্ছে তাহলে কোনো ডাক্তারের পরামর্শমতো ছত্রাকনাশক ওষুধ খান।

- যদি আপনার প্রথমবার এই সমস্যা হয়,
- যদি আপনার বয়স ১৬ বছরের নীচে বা ৬০ বছরের বেশি হয়,
- যদি আপনি গর্ভবতী হন বা আপনার শিশু বুকের দুধ খায়,
- যদি আপনার অস্বাভাবিক কিছু উপসর্গ দেখা দেয়—যেমন হলদেটে, সবজেটে বা লালচে অথবা দুর্গন্ধযুক্ত রস বার হয় বা আপনার যোনিদ্বারের চারপাশে ঘা দেখা যায়,
- যদি আপনার অস্বাভাবিক ঋতুস্রাব হয় বা তলপেটে ব্যথা থাকে,
- যদি গত ৬ মাসে এরকম দু-বার সংক্রমণ হয়ে থাকে,
- যদি আগে ছত্রাকনাশক চিকিৎসায় আপনার অ্যালার্জি হয়ে থাকে বা আগের ছত্রাকনাশক চিকিৎসায় কাজ না হয়ে থাকে,
- যদি আপনার বা আপনার সঙ্গীর আগে যৌনবাহিত রোগ হয়ে থাকে, এবং সেটা আবার হয়েছে বলে আপনার মনে হয়,
- যদি ৭-১৪ দিনের মধ্যে আপনার রোগ উপশম না হয়,

তাহলে আপনার বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত। ভ্যাজাইনাল থ্রাশে এই সব ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু

ডাক্তারবাবু প্রয়োজন পড়লে আপনার যোনি থেকে রসের নমুনা (swab) নিয়ে পরীক্ষা করতে পারেন রোগনির্ণয় সঠিকভাবে করার জন্য। মনে রাখবেন, যোনি থেকে অনেক কারণে রস বেরোতে পারে, এইসব ক্ষেত্রে একজন ডাক্তারই কেবল সঠিক কারণ খুঁজে বের করে তার চিকিৎসা করতে পারেন।

ভ্যাজাইনাল থ্রাশের চিকিৎসা

যদি মৃদু লক্ষণ থাকে তাহলে অল্প সময়ের জন্য ছত্রাকনাশক ব্যবহার করা যেতে পারে—এক-দু-সপ্তাহে সাধারণত উপসর্গ নির্মূল হয়ে যায়। যদি বারবার উপসর্গ ফিরে ফিরে আসে, তাহলে চিকিৎসা দীর্ঘায়িত করতে হতে পারে।

অনেক রূপে ছত্রাকনাশক ওষুধ পাওয়া যায়, যেমন:

✦ পেসারি—বিশেষ ধরনের বড়ি যেটা যোনির ভিতরে রাখতে হয়। সাধারণত এই বড়ির পাতার সঙ্গে একটা প্লাস্টিকের ছোটো জিনিস থাকে যেটার মাথায় বড়িটা রেখে যোনির ভিতরে বড়িটাকে ঢুকিয়ে দিতে হয়, একে অ্যাপ্লিকেটর বলে।

✦ যোনির ভিতরে লাগানোর মলম—যোনির ভিতরের দেওয়ালে ও মুখের চারপাশে এই মলম লাগাতে হয়।

✦ ক্যাপসুল/মুখে খাওয়ার বড়ি—এগুলো গিলে খেতে হয় এবং রোগীর ব্যবহারের জন্য পেসারি বা যোনিদেশে লাগানোর মলমের থেকে সুবিধাজনক, কিন্তু এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া অনেক বেশি।

এই সব ধরনের চিকিৎসাই সমানভাবে কার্যকর, যদিও গর্ভবতী ও বুকের-দুধ খাওয়ানো মায়েদের মুখে খাওয়ার বড়ি ব্যবহার করা উচিত নয়।

অনেক সময় যোনিদেশের মুখে লাগানোর কিছু মলম পাওয়া যায় যেগুলো লাগালে চুলকানিভাব ও জ্বালাভাব একটু কমে কিন্তু সাধারণ ময়েশ্চারাইজার মলমও একই কাজ করে।

কী থেকে হয় এই ভ্যাজাইনাল থ্রাশ?

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ইস্ট প্রজাতির ক্যান্ডিডা নামক একধরনের ছত্রাক থেকে হয় এই সংক্রমণ।

সাধারণভাবে অনেক মহিলার যোনিতেই এই ছত্রাক থাকতে পারে কোনোরকম সমস্যার সৃষ্টি না করেই। কিন্তু যখন যোনিদেশে বসবাস করা অণুজীবদের ভারসাম্য বিঘ্নিত হয় এবং ক্যান্ডিডা বংশবৃদ্ধি করে তখনই দেখা দেয় এই থ্রাশ।

আপনার এই রোগ হওয়ার সম্ভাবনা বাড়বে যদি:

ক. আপনার বয়স ২০ থেকে ৪০ এর মধ্যে হয়—যাঁদের মাসিক শুরু হয়নি অথবা যাঁদের মাসিক বন্ধ হয়ে গেছে তাদের থ্রাশ হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কম।

খ. আপনি গর্ভবতী হন।

গ. আপনি সঠিকভাবে যৌনোত্তেজিত হওয়ার আগেই সঙ্গমে লিপ্ত হন অথবা আপনার সঙ্গমে লিপ্ত হওয়ার সময় আপনি আহত হতে পারেন এই ভয় আপনার মনে কাজ করে। এতে সঙ্গমকালীন সময়ে যোনি শুকনো এবং যোনির দেওয়াল প্রসারিত না হওয়ার কারণে থ্রাশ হতে পারে।

ঘ. অ্যান্টিবায়োটিক খেলে—যোনিতে বসবাস করা অণুজীবদের ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়ে থ্রাশ হতে পারে।

ঙ. রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকলে।

এই রোগ যৌনাচারের মাধ্যমে ছড়ানো রোগ নয় কিন্তু যৌনাচারের সময় যোনি শুকনো থাকলে বা ঠিকমতো প্রসারিত না হলে এই রোগ হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে এবং অনেক সময় যৌন সঙ্গীরও এই ছত্রাক সংক্রমণ হতে পারে।

রোগ প্রতিকারের উপায়

যাঁরা মাঝেমধ্যেই এই সমস্যায় আক্রান্ত হন তাঁরা—

ক. পরিষ্কার জল এবং ময়েশ্চারাইজার সাবান দিয়ে জায়গাটা পরিষ্কার করতে পারেন, কিন্তু দিনে একবারের বেশি পরিষ্কার করা উচিত নয়।

খ. গ্রিজ জাতীয় ময়েশ্চারাইজার যোনির চারপাশে একাধিকবার লাগানো যেতে পারে। (তবে মনে রাখতে হবে বেশি ময়েশ্চারাইজার ব্যবহারে কন্ডোম পাতলা হয়ে যেতে পারে।)

গ. অত্যধিক চাপা অন্তর্বাস-প্যান্ট পরা থেকে বিরত থাকতে হবে, সুতির অন্তর্বাস পরা ভালো।

ঘ. ডায়াবেটিস রোগীদের রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।

একজন পুরুষ কি তাঁর মহিলা সঙ্গিনীর থেকে এই রোগে আক্রান্ত হতে পারেন?

আগেই বলা হয়েছে যে, এই রোগ কিছুই নয়, ক্যান্ডিডা নামক ইস্ট প্রজাতির ছত্রাক সংক্রমণ, যারা আমাদের শরীরে সাধারণভাবে একটা ভারসাম্য মেনে উপস্থিত থাকে কোনো ক্ষতি না করেই। সাধারণত দেখা না গেলেও যৌন মিলনের মধ্য দিয়ে এই ছত্রাক পুরুষ সঙ্গীকে সংক্রমিত করতে পারে।

- পুরুষদের দেহে এই সংক্রমণের উপসর্গ-লক্ষণগুলো হল—
- পুরুষাঙ্গের মাথায় চুলকানি, লালচেভাব এবং অস্বস্তি অনুভব হতে পারে।
- ঘন সাদা ক্ষরণ পুরুষাঙ্গের সামনের চামড়া (foreskin)-র নীচে দেখা যেতে পারে।
- মূত্রত্যাগের সময় ব্যথা অনুভব হতে পারে।

যদি আপনার এই রোগ হয়ে থাকে ওষুধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত বা রোগ নির্মূল হওয়ার আগে পর্যন্ত যৌনসংগমে লিপ্ত না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. কুশল সেন, এমবিবিএস, এক কেন্দ্রীয় সরকারি হাসপাতালে কর্মরত।

চিকিৎসকের চোখে অক্টোবর বিপ্লব

চিকিৎসক হিসেবে আমাদের প্রজন্মের কাছে অক্টোবর বিপ্লবের সার্থকতা কোথায়—লিখেছেন **ডা. অরুণ সিং**।

অক্টোবর বিপ্লব নিয়ে কোনো কথা উঠলে, একবিংশ শতকের চিকিৎসক বা চিকিৎসাবিজ্ঞানের অংশীদার হিসেবে আমাদের একটা সহজ প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়। এক-শো বছর আগে একটা কিছু ঘটেছিল, আজ এতদিন পরে তাই নিয়ে কেন ভাবতে যাব আমরা? সেই ঘটনার কোনো তাৎপর্য এ যুগে নেই, এমনই শুনি চারদিকে, তাহলে? আমাদের নিজেদের সমস্যা কি কম? আমাদের রোগী আছে, চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতির সঙ্গে তাল রাখতে হয়, আর পরিবারকেও তো সময় দিতে হয়। এর মধ্যে আবার পুরোনো সেই ঘটনা নিয়ে ভাবতে যাব কেন আমরা?

আজকে বসে এক-শো বছর আগে ঘটে যাওয়া ঘটনা, যার রেশ পর্যন্ত কবেই চুকে-বুকে গেছে, সেটা নিয়ে সময় খরচ করা নেহাতই বিলাসিতা নয় কি? যারা এসব বিপ্লব-টিপ্লব নিয়ে এখনও ভাবছে, তাদের ইতিহাস খরচার খাতায় ফেলে দিয়েছে। কিন্তু তাদের কেউ কেউ এখনও খোয়াব দেখছে। ফুঃ, তারা জানেই না বর্তমানকাল হল এমন একটা সময় যখন অতীতের অস্তিত্বের দাম নেই। বর্তমানকাল আমাদের ডাকছে। বাঁচো নিজের মতন, অন্যরা বাঁচুক যে যার মতো করে, ব্যস! উৎসব হোক, খানাপিনা, নতুন জামাকাপড়, উপভোগের আলো-ঝলকানি, শব্দ, আর প্রিয়সান্নিধ্য। আমরা পৌঁছে গেছি পৃথিবীর সম্ভাব্য স্বর্গে, তাই না? ইতিহাস? ধুর, গুলি মারো ইয়ার! তবে হ্যাঁ, অমন ভয়ানক সময়ে আমরা জন্মাইনি সেটা ভগবানের দয়া। আর জন্মাইনি যখন তখন ওই সময় নিয়ে ভাবতে বয়েই গেছে।

কিন্তু সমস্ত ডাক্তারদের দুটো প্রশ্ন যুগ যুগ ধরেই তাড়া করে। প্রথম প্রশ্ন, কাকে চিকিৎসা করছে সে, ভিখারি না ভিআইপি, তার ওপরই কেন ডাক্তারের সামাজিক মর্যাদা নির্ভর করে, কেন তার চিকিৎসা-দক্ষতার ওপর নয়? দ্বিতীয়ত, কেন স্রেফ রোগ হলে সেই রোগ ধরে রোগীর চিকিৎসা করেই বেড়াব আমরা, কেন রোগকে আটকাতে, তাকে নিশ্চিহ্ন করা না হোক কমাতে, ডাক্তারের জ্ঞান থাকবে, কিন্তু কার্যকর ভূমিকা কেন থাকবে না? আমরা কি তবে সমাজের কয়েকটা ভাড়াটে হাত, যারা অন্যের মস্তিষ্কচালিত হয়েই চলে? আমাদের এত পরিশ্রম কি তবে সরাসরি বা ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে অন্য কারও সুবিধা করে দেবার আর লাভ জোগানোর কাজে লাগে? তাহলে বিজ্ঞান আর যুক্তির কথা বলেও আমরা কি কোথাও অন্ধ হয়ে আছি, একচক্ষু হরিণের মতো? আমরা কি তবে এক প্রশ্নহীন চিন্তার স্বাধীনতা বিসর্জন দেওয়া মানুষের ভিড়ের অংশমাত্র? বা, আমরা কি আদৌ মানুষ, কেননা গতানুগতিক পথকে প্রশ্ন করেই নিজের চলার পথ না বাছলে মনুষ্যত্বের কীই-বা অবশিষ্ট থাকে?

নোবেলজয়ী চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমন মৃত্যুর আগে বলেছিলেন, "আমার জীবন একেবারে বৃথাই গেল। প্রথম এশিয়ার মানুষ হিসেবে নোবেল প্রাইজ পেয়ে আমি ভেবেছিলাম এদেশে সত্যিকারের বিজ্ঞানচর্চা করার রাস্তা তৈরি করব, কিন্তু আমাদের দেশে শুধু অনুগতদের দলই তৈরি হয়, আর তা দিয়ে মুক্তির পথ খোঁজা বৃথা।"

কেন এ ব্যাপারটা ঘটে? বিজ্ঞানের বিভিন্ন ব্যবস্থাপনার মালিকানা কিছু লোক বা গোষ্ঠীর হাতে, আর শেষ বিচারে তারাই ঠিক করে কীভাবে বিজ্ঞানের ব্যবহার হবে আর বিজ্ঞান কোন পথে এগোবে। এই অবস্থা চিকিৎসক বা বিজ্ঞানীর মালিকের স্বার্থের পক্ষে বিনা প্রশ্নে দাঁড়ানোকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে।

একবার ভাবা যাক আপনি ডাক্তার, কিন্তু আপনি চিকিৎসা করেন শ্রমিক-কৃষকের, বিশেষ করে অদক্ষ শ্রমিকের, যাঁরা সমাজের নিম্নতম ধাপে আছেন। এঁরাই জনসংখ্যার শতকরা সত্তর ভাগ। আপনি চিকিৎসা করেন যে শ্রেণির সেই শ্রেণির উদ্দেশ্য, এক কথায়: "আমরা সবাই কাজ করি, আর আমরা সবাইকে খাওয়াই।" যদিও এঁরাই সমস্ত খাদ্য উৎপাদন করেন, এঁদের নিজেদের বাচ্চারা ক্ষুধায় ভোগে। এঁদের চিকিৎসা করলে সমাজ আপনাকে ডাক্তার হিসেবে নীচু নজরেই দেখবে। আপনি সমাজের চোখে একজন দরিদ্র ডাক্তার হিসেবে গণ্য হবেন, যদিও জ্ঞানের দিক থেকে আপনি মোটেই দরিদ্র নন।

এবার দ্বিতীয় ধাপ। আপনি হলেন ছোটো ব্যবসায়ী, হস্তশিল্পী,

দোকানদার—এঁদের ডাক্তার। এঁদের সাধারণ বিবরণ হল: "তোমাদের জন্যই অন্যরা খেতে পায়।" এঁরা জনসংখ্যার শতকরা ১৫-২০ ভাগ। এবার সমাজ আপনাকে ডাক্তার হিসেবে গ্রহণযোগ্য ভাববে, কিন্তু আপনি এখনও শ্রেষ্ঠ ডাক্তারের আসন পাবেন না। এর ওপরে রয়েছে আরেকটা শ্রেণি—মিলিটারি, প্যারামিলিটারি, পুলিশ ইত্যাদি। তাঁদের সেবা করা ডাক্তার হলে আপনি হবেন সুবিধাভোগী। আর এই শ্রেণিগুলোর সাধারণ বিবরণ হল: "আমরা তোমাদের হত্যা করতে পারি।" এরও ওপরে আছে ধর্মগুরু, বড়ো কাগজের মালিক-সাংবাদিক, এঁদের সাধারণ বিবরণ হল: "আমরা তোমাদের বোকা বানাই।" এদের

প্রথম প্রশ্ন, কাকে চিকিৎসা করছে সে, ভিখারি না ভিআইপি, তার ওপরই কেন ডাক্তারের সামাজিক মর্যাদা নির্ভর করে, কেন তার চিকিৎসা-দক্ষতার ওপর নয়?

ডাক্তার হতে পারলে আপনি বেশ ভালো অবস্থায় পৌঁছেছেন, কিন্তু এখনও উচ্চতম মার্গে যাননি। এর ওপরে পঞ্চম ধাপে আছে শাসকরা, অর্থাৎ রাজনীতির উচ্চস্তরের লোক, এমপি, এমএলএ, রাজাগজারা। এঁদের সাধারণ বিবরণ হল: "আমরা তোমাদের শাসন করি।" এঁদেরও ওপরে কিন্তু আছেন উচ্চতম দল, পুঁজিপতি আর একচেটিয়া ব্যাবসামালিক, যাঁদের সাধারণ বিবরণ হল: "আমরা দেশ, পৃথিবী ও সব নীতির নিয়ন্ত্রণকর্তা।" এঁদের চিকিৎসক হয়ে উঠতে পারলে তবেই আপনি সেরা ডাক্তার আর সবথেকে বেশি সুবিধাভোগী।

শেষের দলটি, পুঁজিপতি আর একচেটিয়া ব্যাবসামালিক, সংখ্যায় দেশের শতকরা ১-৩ ভাগ মাত্র, কিন্তু এরাই রাজনীতিবিদ, ধর্মগুরু, মিলিটারি, পুলিশ ইত্যাদির মাধ্যমে সরাসরি, আর পরোক্ষে বুদ্ধিজীবী আর মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মাধ্যমে মনোজগত দখল করে, দেশের শাসনব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখে। এই ব্যবস্থার দুটো বৈশিষ্ট্য আছে। টাকা নীচ থেকে ওপরে গিয়ে সঞ্চিত হয়, আর কাজের ভার ওপর থেকে নীচের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়। ফলে দরিদ্র হয় দরিদ্রতর, আর ধনী হয় আরও ধনী। ওপরের তলার এই লোকগুলোই বিজ্ঞানকে নিয়ন্ত্রণ করে, কোনদিকে তার বিকাশ হবে সেটা ঠিক করে। সেটা করতে তারা কেবল

কেন স্রেফ রোগ হলে সেই রোগ ধরে রোগীর চিকিৎসা করেই বেড়াব আমরা, কেন রোগকে আটকাতে, তাকে নিশ্চিহ্ন করা না হোক কমাতে, ডাক্তারের জ্ঞান থাকবে, কিন্তু কার্যকর ভূমিকা কেন থাকবে না?

সরাসরি ক্ষমতা আর টাকা ব্যবহার করে তা কিন্তু নয়। তারা বিজ্ঞানী থেকে চিন্তাবিদ, অর্থনীতিজ্ঞ থেকে চিকিৎসক, এদের সবাইকে ব্যবহার করে একই ধাঁচের চিন্তার একটা পরিমণ্ডল তৈরি করে।

'অক্টোবর বিপ্লব' হল ওই নীচের তলার শতকরা সত্তরজনকে এই পুরোনো ব্যবস্থার সাঁড়াশির থেকে মুক্ত করার চেষ্টা, যাতে আমাদেরও মুক্তি হয়। যাতে আমরা মুক্তভাবে রোগ দেখতে পারি, চিকিৎসাশাস্ত্রকে মুক্তভাবে মানুষের স্বার্থে প্রশ্ন করতে পারি, এমনকী মুক্ত হয়ে কবিতা লিখতে পারি, কথা বলতে পারি, আর আর্থিক মুক্তি অর্জন করতে পারি। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. অরুণ সিং, শিশুরোগবিদ। বর্তমানে নবজাতকের যত্নবিষয়ক জাতীয় উপদেষ্টা। ১৯ ডিসেম্বর, ২০১৭-এ স্বাস্থ্যের বৃত্তে পত্রিকা-আয়োজিত সপ্তম ডা. পার্থসারথি গুপ্ত স্মৃতি বক্তৃতার বক্তা ছিলেন তিনি। সেই উপলক্ষে তাঁর একটি ইংরেজি লেখার বাংলা অনুবাদ 'অক্টোবর বিপ্লব ও স্বাস্থ্য—একটি উপক্রমণিকা' নামক পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয়। তারই অংশবিশেষ প্রকাশ করা হল এবারের পত্রিকায়।

একক মাত্রা

Advt.

গদ্য প্রবন্ধের এক আধুনিক ক্যানভাস

সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, স্বাস্থ্য, মিডিয়া ও বিবিধ বিষয়ে এক অন্যতর গবেষণা ও আলোচনাপত্র

পাওয়া যাচ্ছে প্রায় সমস্ত স্টলে

গ্রাহক চাঁদা: ১০০ টাকা (বার্ষিক), ২০০ টাকা (বার্ষিক), ২০০০ টাকা (আজীবন)

আজীবন গ্রাহকেরা পুরনো সংখ্যার একটি সেট বিনামূল্যে পাবেন

যোগাযোগ: ১৫০, মুক্তারাম বাবু স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০০৭

দূরভাষ: ৯৮৩০২৩৬০৭৬/৯৮৩০৪৯৩২৩৯

৫ম সন্দীপ্তা চ্যাটার্জী স্মৃতি বক্তৃতা

স্বাস্থ্যের অধিকার রক্ষার সংগ্রামে চিকিৎসক

রোগী-চিকিৎসক সম্পর্ককে উন্নত করতে হলে চিকিৎসকদের জনগণের স্বাস্থ্যের অধিকারের সংগ্রামে শামিল হতে হবে—বলেছেন **ডা. রেজাউল করিম**।

আমার বয়স তখন খুব কম। সেবার বাবার শরীর বেশ খারাপ। মাঝে মাঝে অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছেন। গাঁয়ের একমাত্র ডাক্তারের কোনো মেডিক্যাল ডিগ্রি নেই। কয়েক বছর ঢাকায় মেডিক্যাল পড়ে পরীক্ষা না দিয়ে চলে আসেন। রাতবিরেতে তিনিই ভরসা। বেশি বাড়াবাড়ি হলে ১০-১২ কিলোমিটার দূরে সরকারি হাসপাতাল। বর্ষাকালে গ্রামের রাস্তাঘাট কর্দমাক্ত, পুকুরগুলোও ছাপিয়ে যাচ্ছে। বাবার জন্য ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি ঘনঘন। তিনি ওষুধপত্র দিচ্ছেন। তারপরে ভরসা করে সবাই ধৈর্য ধরে আছে। ডাক্তার খুব চেষ্টা করছেন—এরপর যা হবার হবে। ভগবান যদি মারে মানুষ কী করতে পারে!! আজ চল্লিশ বছর পর পেছন পানে তাকাতে গেলে একাধারে ভীত ও চমকিত হই। ভীতির কথা আগে বলি—বাবার যে অসুখটি হয়েছিল, তার নাম ইন্টারমিটেন্ট কমপ্লিট হার্ট ব্লক—সেটা ধরা পড়ল আরও ১২-১৩ বছর পর। ডাক্তার জানতেন কিনা জানি না, অন্তত আমাদের জানাননি। যে ওষুধটি দিতেন তা হৃদ্‌স্পন্দন বাড়াতে সাহায্য করত। চমক লাগে এই কথা ভেবে যে কত গভীর পারস্পরিক বিশ্বাস ও আস্থার সম্পর্ক ছিল যা অমলিন ও অটুট রাখার জন্য কোনো অতিরিক্ত বলের দরকার হয়নি। এখনও গ্রামে-গঞ্জে যে অসংখ্য অপাশকরা চিকিৎসক আছেন তাঁদের সঙ্গে মানুষের বিশ্বাস ও আস্থার সম্পর্ক একই রকম আছে—পাশকরা চিকিৎসক ও রোগীর সম্পর্ক বিগত চারদশকে পরিবর্তিত হলেও তার বিষাক্ত ছায়া এই সম্পর্কে তেমন কোনো প্রভাব ফেলেনি। প্রশ্ন হল—কী এমন ঘটছে যাতে রোগী-চিকিৎসক সম্পর্কের ক্রমাবনতি হয়েছে? বা অন্যভাবে বললে—কেন অপাশকরা চিকিৎসকদের সঙ্গে তাঁদের রোগীদের সম্পর্কের অবনতি হয়নি?

অপাশকরা চিকিৎসকদের কিছু সুবিধা আছে। তাঁরা গ্রামের বা এমনকী শহরের প্রায় একই আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ থেকে উঠে এসেছেন। তাঁদের পারস্পরিক আস্থা কোনো তাৎক্ষণিক বা সাময়িক সম্বন্ধজনিত নয়। দ্বিতীয়ত তাঁরা সাধারণত যেসব রোগ-ব্যাধির চিকিৎসা করেন তা অনেকাংশে নিরাময়যোগ্য ও চিকিৎসার খরচটিও খুব বেশি না। দেশের আপামর দরিদ্র মানুষ চিকিৎসককে সমাজবন্ধু ও বিপদের দিনে নিজেদের সহায় ভাবতে চান। প্রতীচী ট্রাস্ট বীরভূম জেলায় ও ঝাড়খণ্ডের দুমকায় একটি সমীক্ষা চালিয়েছে। সে সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে সাধারণ অসুখে রোগীদের প্রথম পছন্দ অপাশকরা চিকিৎসক। কাছাকাছি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে তাঁরা যান যখন গ্রামীণ চিকিৎসক তাঁদের সারাতে পারেন না। সেক্ষেত্রে তাঁদের চিকিৎসার সর্বমোট খরচটি কিন্তু বেড়ে যায়। তাহলে আমরা বুঝলাম যে, রোগী-চিকিৎসক সম্পর্কের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল পারস্পরিক আস্থা অর্জন।

পাশকরা চিকিৎসক যে আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিন্যাস থেকেই আসুন না কেন, তিনি তাঁর অধীত বিদ্যা প্রয়োগ করতে চান পেশাদারের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান অনেকাংশে যন্ত্র-নির্ভর। সদ্য পাশকরা ডাক্তারটি যদি তাঁর শৈশব-কৈশোরের জন্মভূমিতে ফিরে যেতে পারেন তাহলে মানুষের আস্থা অর্জনের জন্য তাঁকে আলাদা পরিশ্রম করতে হয় না কিন্তু কম চিকিৎসকের পক্ষেই এই কাজটি করা সম্ভব হয়েছে। আমার সহপাঠী রামেশ্বর মুখার্জি ডাক্তারি পাশ করে একটি মাইক্রোস্কোপ ও একটি স্টেথোস্কোপ সঙ্গী করে ত্রিশ বছর আগে

আস্থা অর্জনের প্রাথমিক পদক্ষেপ হল: সহানুভূতিপূর্ণ সহৃদয় ব্যবহার ও রোগীর প্রতি অখণ্ড মনোযোগ ও তাঁর সমস্যাটি তাঁর মতো করে বোঝার চেষ্টা করা।

বাঁকুড়ায় তার নিজের গ্রামে ফিরে গেছিল। আজ সে এলাকার নামকরা চিকিৎসক ও সত্যিকারের সমাজ-বন্ধু। চিকিৎসক-রোগী সম্পর্কের ভীতিকর অবনতির যুগে সে নিজের এলাকায় প্রায় রামরাজত্ব স্থাপন করেছে। আমি নিজেও আমার গ্রামে বেশ কিছুদিন রোগী দেখেছি—বিশালসংখ্যক মানুষ এসেছেন তাঁদের নানারকম সমস্যা নিয়ে।

অনেকে সেরে গেছেন, অনেককে সারাতে পারিনি কিন্তু পারস্পরিক সম্পর্ক সেখানে অটুট ছিল।

আমরা এমন বলছি না যে চিকিৎসককে তাঁর জন্মভূমিতে ফিরে যেতেই হবে, না হলে তিনি মানুষের আস্থা অর্জন করতে পারবেন না। আস্থা অর্জনের প্রাথমিক পদক্ষেপ হল: সহানুভূতিপূর্ণ সহৃদয় ব্যবহার ও রোগীর প্রতি অখণ্ড মনোযোগ ও তাঁর সমস্যাটি তাঁর মতো করে বোঝার চেষ্টা করা। চিকিৎসক অনেক ক্ষেত্রে তা ইচ্ছা থাকলেও করতে পারেন না। প্রথমত সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে রোগী-চিকিৎসকের গড় অনুপাত হল প্রায় ১ : ২০০০। চিকিৎসক-রোগীর পরস্পরের সাথে বাক্যালাপের সময়টিও অত্যন্ত সীমিত। গড়ে একজন চিকিৎসক রোগী পিছু এক মিনিট সময় পান। ফলত তাদের মধ্যে কোনো সম্পর্ক গড়ে উঠছে না। রোগীকে ভালোভাবে পরীক্ষা না করেই উপসর্গ অনুসারে চিকিৎসা প্রদান করা হয়। বাড়তি অনেক অপ্রয়োজনীয় ঔষধ প্রয়োগ করা হয়। উলটোদিকে রোগী-চিকিৎসকের মধ্যে বিশ্বাস ও আস্থার সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার আগেই সম্পর্কের ইতি হয়। উচ্চ দাম হওয়ায় প্রয়োজনীয় কিন্তু দামি ঔষধ অনেক সময় কেনা হয় না। অসুখ সারে না বা জটিলতা তৈরি হয়। সম্পর্কটি বিষিয়ে যায়।

রোগী ও চিকিৎসকের সম্পর্কটি দাঁড়িয়ে আছে পারস্পরিক বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার উপরে। মানুষ স্বচ্ছন্দে ডাক্তারের ছুরির সামনে গলা পেতে দিতে পারেন, কারণ তিনি জানেন যে চিকিৎসক তাঁর গলার কাঁটাটুকুই শুধু সরিয়ে তাঁকে সুস্থ করে তুলবেন। চিকিৎসককে ভগবানের সঙ্গে তুলনা করার অনুষঙ্গের জন্ম এভাবেই। কিন্তু, চিকিৎসক আবার একজন পেশাদার মানুষ, তাঁর ঘর-সংসার প্রতিপালন করার জন্য, সংসার বৈতরণী পেরোনোর জন্য পারানির কড়ি লাগে। সে কড়ি ভগবানকে নিতে হয় ভক্তের পকেট থেকে। অর্থ অতি বিষম বস্তু। একটি হিসেবে দেখা যাচ্ছে—সরকারি হিসেব—যে প্রতি বছর চিকিৎসার খরচ মেটাতে গিয়ে পাঁচ শতাংশ মানুষ, মানে সারা দেশে প্রায় ৬ কোটি মানুষ, নতুন করে দরিদ্র হচ্ছেন। এদেশে যেমন আম্বানী, আদানীদের মতো বড়োলোক আছেন তেমনি হতদরিদ্র মানুষ আছেন। তাঁরা শেষ সম্বলটুকু তাঁদের প্রিয়জনের জন্য রেখে যেতে চান। কিন্তু চিকিৎসার খরচ মেটানো যখন তাঁদের ক্ষুধার অন্ন কেড়ে নেওয়ার নামান্তর তখনই বাধে গোলমাল। প্রশ্ন হল কে দেবে এই অর্থ? আমাদের শাসকরা স্বাস্থ্য ব্যক্তিগত দায়িত্ব বলে জনগণের ঘাড়ে দায় চাপিয়ে দেন। শুধু এখন নয়—এ আমাদের অনাদি-অনন্তকালের সংস্কৃতি। চাণক্য নাগবংশ ধ্বংস করে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যকে সিংহাসনে বসিয়ে ছিলেন। সাম্রাজ্য পরিচালনায় তাঁর ক্ষুরধার বুদ্ধির প্রশংসা করা হয়। তিনি নানা বিষয়ে খুব কার্যকরী একটি বই লেখেন—অনেকটা প্রিন্সের মতো, কিন্তু অনেক বেশি মেধাসম্পন্ন—বর্তমানে তার সংক্ষিপ্তসার যেটি টীকাসহ তা প্রায় ৭০০ পাতার বই—সেখানে স্বাস্থ্য নিয়ে তেমন আলোচনাই নেই। এই হল শাসকের মানসিকতা—ভিষগাচার্য একজন থাকতেন, তিনি রাজবৈদ্য, রাজা ছাড়া অন্যের চিকিৎসা তাঁর দায়িত্ব নয়। আম-জনতার স্বাস্থ্য তাই অবহেলিত থেকে গেছে। সময় পালটেছে, যুগের সঙ্গে বিশ্ব পালটেছে কিন্তু আমরা পালটাইনি। ইউরোপে অনেক দেশে নিয়মতান্ত্রিক রাজা আছেন, রাজতন্ত্রও আছে কিন্তু জনগণের স্বাস্থ্যরক্ষায় সেই সব দেশ সদা-তৎপর। সরকারের সারা বছরের যা আভ্যন্তরীণ উৎপাদন তার শতকরা ৬-১০ ভাগ স্বাস্থ্যের জন্য ব্যয় হয়। এদেশে সেই পরিমাণ ১.২%। অতীতে আমাদের গড় আয়ু কম ছিল—আমাদের ব্যক্তিগত চাহিদা বলতে ছিল এদেশের আবহমানের সংস্কার মেনে সব অন্যায় অবিচার নিয়ে ঈশ্বরের কাছে নালিশ, আর ফরিয়াদ। অথচ, আমরা কিন্তু আর শান্ত তপোবনের যুগে পড়ে নেই—বিজ্ঞানের অগ্রগতি হয়েছে। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের উন্মেষ হয়েছে, ত্যাগে মোক্ষলাভ কিংবা সম্পদ ও দারিদ্র শ্রীভগবানের পাদপদ্মে সমর্পণ করার জন্য আর তেমন সাড়া পাই না। ঈশ্বরকে বিজ্ঞান খুঁজে দিতে পারে না তাই অচলা ভক্তিতে খামতি পড়ছে। এই সময়ে স্বাস্থ্য নিয়ে সচেতনতা বেড়েছে কিন্তু আয় বাড়েনি। সরকার স্বাস্থ্যের জন্য ব্যয় করে না, হাসপাতাল বাড়েনি, যখন অসহায় শিশু তিল তিল করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তখন কার কাছে ফরিয়াদ করব?

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রোগী আর চিকিৎসকের যে স্বাভাবিক ও "পবিত্র" সম্পর্ক তার মাঝখানে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অদৃশ্য শক্তি আছে—সে হল সরকার, যার কাছে প্রয়োজনীয় অর্থ আছে, যার হ্যান্ডনোটকে আমরা অর্থ বলে জানি। সেই অদৃশ্য শক্তিই সবচেয়ে শক্তিশালী। আগে যেমন ছিল অদৃশ্য ভগবান, এখন তেমনি সরকার। এখানে রোগী ও চিকিৎসক দু-পক্ষের কাছেই তিনি সমান গুরুত্বপূর্ণ। দু-জনেই দাবি করতে পারে—তোমার কর্ম তুমি করো মা, লোকে বলে করি আমি। এদেশের মানুষ যে ছ-টি রোগে সাধারণত মারা যান তার বেশিরভাগই জনস্বাস্থ্যঘটিত সমস্যা—যার দায়ভার অনেকাংশে সরকারের। শিক্ষা, পানীয় জল, পুষ্টি, বাসস্থান ইত্যাদি—সরকার যেগুলির দায়ভার নেবে বলে ঘোষণা করেছে সেগুলি পর্যাপ্তভাবে সম্পাদন করতে পারলে নিশ্চয়ই এত রোগে প্রাণহানি আর বিপুল সম্পদের এত অপচয় হত না। বিশেষত শিক্ষার কথা একটু আলাদা উল্লেখের দাবি রাখে। ইউনিসেফ শিক্ষাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়োগ বলে ঘোষণা করেছিল। এখানে শিক্ষা বলতে এম সি কিউ মুখস্থ করার কথা হচ্ছে না। শিক্ষা মানে যা মনের প্রসার ঘটায়, যা মানুষের অন্তর্নিহিত গুণাবলির স্বাভাবিক স্ফূরণ ঘটায় সেই শিক্ষার কথা বলা হচ্ছে। সেই শিক্ষা সক্ষমতা বাড়ায়, মানুষ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যেসব উদ্যোগ আয়োজন লাগে, যা দিয়ে সত্যি মিথ্যে যাচাই করতে পারা যায়, আলো থেকে অন্ধকার, সত্য থেকে মিথ্যাকে আলাদা করা যায়—তার নাম শিক্ষা। সেই শিক্ষা আনে সচেতনতা আর সচেতনতা আনে রোগ থেকে মুক্তি, কুসংস্কার থেকে মুক্তি—সামগ্রিকভাবে জীবনযাত্রা উন্নততর করতে কাজে লাগে সে শিক্ষা। একটা রিপোর্ট বের করেছে প্রতীচী ট্রাস্ট—শিক্ষা নিয়ে ওঁরা কাজ করেন—সেখানে দেখা যাচ্ছে যে একজন রোগী একই রোগের

জন্য যা খরচ করেন সে ক্ষেত্রেও শিক্ষার মূল্য আছে—গরিব নিরক্ষর আদিবাসীর চিকিৎসা ব্যয় শিক্ষিত বা সাক্ষর আদিবাসী মানুষের চেয়ে বেশি। তাহলে দেখা যাচ্ছে যার যত আয় কম তুলনায় শতাংশ হিসেবে তার চিকিৎসা খরচ বেশি।

বহুমাত্রিক সম্পর্ক নিয়ে আরো আলোচনা করলে এটা ধীরে ধীরে বোঝা যাবে যে, রোগী আর ডাক্তারের সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণ করার মালিক এঁরা নন, এঁরা হলেন পুতুল নাচের পুতুল, যার রশি আছে অন্যের হাতে। সে সবল লোমশ হাত হল রাষ্ট্রের হাত। রাষ্ট্রের কাজ হল বিরোধ কমিয়ে আপাত-সমন্বয় তৈরি করা যাতে সংঘাত কমে। তারা বিবাদমান শ্রেণির মধ্যে সংঘাত কমিয়ে দিতে সচেষ্ট কিন্তু সে সমন্বয় মানুষের দৈনন্দিন চাহিদা না মেটালেও শাসকের কিছু যায় আসে না। তাই, তারা খুব সুকৌশল মিথ্যাচার করে নিজেদের ভালো প্রমাণ করার চেষ্টা করে। কথায় আছে—তিনরকম জিনিস নিয়ে আমরা কারবার করি—সত্য, মিথ্যা ও তথ্য। সত্য আর মিথ্যাকে তথ্য দিয়ে গুলিয়ে দেওয়া যায়। তাই তথ্যের অধিকারের সপক্ষে আইন করে পার্লামেন্ট, কিন্তু পুষ্টির অধিকার বা স্বাস্থ্যের অধিকারের জন্য আইন নেই। তাই ডেঙ্গু হলে সরকার বলে আমরা মুম্বইয়ের চেয়ে ভালো—ওদের ছ-শো মারা গেছে, আমাদের ৩৪। আপনি একটি নম্বর—৬৯৫ বা এরকম কিছু। হীরে খনিতে কাজ করুন আর কারখানায় লোহা পেটান সেখানে আপনার প্রাপ্য হল যেটুকু না পেলে আপনি মরবেন না সেটুকু। বাকি মুনাফা যাবে শেঠেদের হাতে বা তাদের কর্মচারীর হাতে। সেই কর্মচারীদের ওরা পার্লামেন্টে পাঠায়, নিজেদের সুবিধা মতো আইন তৈরি করিয়ে নেয়।

প্রশ্ন হল—এই যে সরকার নামক জগদ্দল রেফারি রোগী আর ডাক্তারকে গজকচ্ছপ লড়িয়ে দিচ্ছে আর নিজেরা নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে, কী করে সেখান থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। মুক্তির সহজ সরল কোনো রাস্তা নেই। কিন্তু কিছু যৌক্তিক দাবি পূর্ণ হলে পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝি দূর করা সম্ভব। সরকারের অধুনালুপ্ত যোজনা কমিশনের এক উচ্চ-স্তরীয় বিশেষজ্ঞ দল একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে সরকারকে কিছু পরামর্শ দিয়েছিল। কিন্তু সরকার সেই পরিকল্পনা গ্রহণ করেনি। সেখানে বলা হয়েছিল—সরকার স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ বাড়িয়ে ২.৫-৩% করবে, সবার জন্য অভিন্ন, সমমানের স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তুলবে। কাউকে এর জন্য বাড়তি খরচ করতে হবে না। ধনী দরিদ্র বিভাগ করা হবে না। প্রকৃতপক্ষে উন্নত স্বাস্থ্যব্যবস্থা তৈরি করে সেখানে সরকারের পরিচালকদেরও চিকিৎসা হবে এটাই বাঞ্ছনীয়। রাজাদের জন্য তৈরি খাবার রাঁধুনিকে খাওয়ানোটাই সবচেয়ে ভালো পন্থা। সর্বজনীন স্বাস্থ্যে অনেক সময় নানাভাবে ফড়েরা ঢুকে পড়ে ইন্সুরেন্স নিয়ে। বেসরকারি ইন্সুরেন্স যেন নাক গলাতে না পারে তার জন্য উপযুক্ত পরিকাঠামো তৈরি করার কথা বলা হয়। আরেকটি ভালো দিক হল—এই খরচ তোলার পদ্ধতিও বিশেষজ্ঞ দল বাতলে দিয়েছিল। এতদিন স্বাস্থ্য সেস বা ওই ধরনের কোনো ইনডিরেক্ট ট্যাক্স দিয়ে স্বাস্থ্য খরচ তোলার পরিকল্পনা করা হত। এদেশে খুব কম মানুষ ডাইরেক্ট ট্যাক্স দেন। তাদের উপর সামান্য ট্যাক্সেও যে বিপুল অর্থ উঠে আসত তা দিয়ে অতি সহজেই এই কর্মসূচি রূপায়ণ করা যেত। কিন্তু সরকার এই প্রস্তাব মানেনি।

রোগী-চিকিৎসক সম্পর্ক উন্নত করবার যে সহজতম পথটি ছিল সেটা অতএব বাতিল। দীর্ঘ জটিল পথ তাই পেরোতে হবে। আমি নিজে বিশ্বাস করি পরিকাঠামো উন্নয়ন করে রোগীদের আরেকটু ভালো পরিষেবা দেওয়া জরুরি কিন্তু একইভাবে জরুরি হল মানুষের আস্থা অর্জন করা। আস্থা অর্জনের জন্য দরকার নিজেদের মানুষের প্রতিদিনের বেদনায় সমব্যথী হওয়া, তাদের দাবি-দাওয়ায় শরিক হওয়া। উন্নাসিকতার গজদন্ত মিনার ছেড়ে উন্মুক্ত সরণিতে তাদের সমপর্যায়ে দাঁড়াতে হবে। তার প্রাথমিক ধাপ হতে পারে সর্বজনীন স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যের অধিকারের দাবিতে পথে নামা। মানুষের এই দাবি চিকিৎসকদের ভেতর থেকে উঠে আসতে হবে। যদি চিকিৎসক সন্ত্রাসমুক্ত চিকিৎসা ব্যবস্থা চান তাহলে সবার জন্য সমমানের চিকিৎসা ব্যবস্থা রচনা করতে হবে। এ রামায়ণের সত্যিকারের বাল্মীকি হতে পারেন চিকিৎসকরা—তাঁরা তাঁদের অধীত জ্ঞান দিয়ে জানেন চিকিৎসার অতীত ভবিষ্যৎ। স্বাস্থ্যের মতো বৃহৎ আন্দোলনে তাঁরা যদি নেতৃত্ব দিতে পারেন তাহলে সম্পর্ক সহজ হবে। সর্বজনীন স্বাস্থ্য যদি রাজনৈতিক অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে সমাজের অন্য অংশীদারের মতো তাঁরাও সেখানে নিজেদের মত জানানোর সুযোগ পাবেন। ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাসে বিপর্যস্ত চিকিৎসকদের কাছে এ একটি বড়ো সুযোগও—নিজেদের সমাজবন্ধু হিসেবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার সুযোগ। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার সবাইকে করতে হবে—চিকিৎসক ও রোগীর সার্বিক ঐক্যই পারে হৃত সম্মান পুনরুদ্ধার করে চিকিৎসককে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

উন্নাসিকতার গজদন্ত মিনার ছেড়ে উন্মুক্ত সরণিতে তাদের সমপর্যায়ে দাঁড়াতে হবে। তার প্রাথমিক ধাপ হতে পারে সর্বজনীন স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যের অধিকারের দাবিতে পথে নামা।

বক্তা পরিচিতি: ডা. রেজাউল করিম, এমবিবিএস, এমডি, একটি সরকারি মেডিক্যাল কলেজের রেডিয়োলজির বিভাগীয় প্রধান। ডাক্তারদের সংগঠন ওয়েস্ট বেঙ্গল ডক্টরস' ফোরামের সভাপতি।

২০১৭-র ১৯ ডিসেম্বর সন্দীপ্তা চ্যাটার্জী স্মৃতি বক্তৃতা উপলক্ষে এই বক্তৃতা ফোল্ডার আকারে প্রকাশিত হয়।

ডাক্তার কবে আসবে রোগীর কাছে?

রোগী ডাক্তারের কাছে বিপদে পড়ে যাবে, এটাই যেন স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু এমন দেশ কি কোথাও আছে যেখানে ডাক্তারই যান রোগীর কাছে? বিবিসি থেকে সংগৃহীত এক রিপোর্ট বলছে এমন এক দেশের কথা।

যে দেশে ডাক্তার যান মানুষের ঘরে ঘরে . . . এমন স্বপ্নের দেশ আছে নাকি পৃথিবীতে?

ভাবুন তো দেখি, ডাক্তার এসে আপনার দরজায় কড়া নাড়ছেন। সে বাড়িতে এসেই আপনার পুরো স্বাস্থ্য পরীক্ষা করছেন। শুধু আপনারই নয়, স্বাস্থ্য পরীক্ষা হচ্ছে আপনার পরিবারের সবার।

আপনার রক্তচাপ মাপা হচ্ছে, হৃদ্‌যন্ত্র পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে, জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে চাকরি এবং জীবনযাত্রা সম্পর্কে। আপনার ঘরবাড়ি, আশপাশের পরিবেশ সম্পর্কেও সতর্কতার সঙ্গে নোট নিচ্ছেন ডাক্তার। যাচাই বাছাই করে দেখছেন আপনার বা আপনার পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্যহানি ঘটে এমন কোনো উপাদান আশপাশে রয়েছে কিনা।

এটা কিউবার স্বাস্থ্যসেবা পদ্ধতির বিবরণ।

কিউবার স্বাস্থ্য সেবা মধ্যম ও নিম্ন আয়ের দেশগুলোতো বটে, বহু ধনী দেশের স্বাস্থ্য সেবাকেও ছাড়িয়ে গেছে।

স্বাস্থ্যখাতে মাথাপ্রতি মোটে ৪৩১ মার্কিন ডলার খরচ করে কিউবার শিশুমৃত্যুর হার এখন যুক্তরাষ্ট্রের চাইতে কম, গড় আয়ু যুক্তরাষ্ট্রের সমান। অথচ যুক্তরাষ্ট্র স্বাস্থ্যখাতে মাথাপ্রতি খরচ করে সাড়ে আট হাজার ডলারের বেশি।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা মনে করছে, তারা কীভাবে এটা করছে সেটা দেখে অন্য দেশগুলোও শিখতে পারে। ধনী কিংবা গরিব, সব দেশেরই এখান থেকে শেখার আছে।

কিউবায় সরকার বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা দেয় এবং সবার জন্য এই সেবা সমান।

কিউবায় অবশ্য ডাক্তারের কোনো অভাব নেই।

এক কোটি দশ লাখ মানুষের জন্য দেশটিতে নব্বই হাজার ডাক্তার। অর্থাৎ প্রতি এক হাজার মানুষের জন্য আটজন ডাক্তার। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি এক হাজার মানুষের জন্য আড়াই জন ডাক্তার, যুক্তরাজ্যে রয়েছে ২.৭ জন।

দেশটিতে এই প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবা মডেলের চাবিকাঠি হচ্ছে বার্ষিক স্বাস্থ্য পর্যালোচনা।

অর্থাৎ যে ডাক্তার বা যে ক্লিনিকটির আওতায় যতগুলো পরিবার এখানে চিকিৎসাধীন থাকবে তাদের প্রত্যেকের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে বার্ষিক ভিত্তিতে।

নাগরিকেরা যদি বার্ষিক পরীক্ষণের জন্যে ডাক্তারের কাছে বা ক্লিনিকে আসতে না চায় তাহলে তার বাড়িতে যাওয়া হবে, এবং যেখানেই থাকুক তাকে খুঁজে বের করা হবে।

ড. কুইভ্যাস হিল রসিকতা করে বলছিলেন, 'আমার নার্স জানে তারা কোথায় থাকে। তারা দৌড়াতে পারবে, কিন্তু পালাতে পারবে না।'

বার্ষিক স্বাস্থ্য পরীক্ষণের এই তথ্য সন্নিবেশ করে চিকিৎসকেরা নির্ধারণ করেন কোন নাগরিক স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে আছেন আর কোন নাগরিক ঝুঁকিমুক্ত।

এখানে উদ্দেশ্য একটাই, রোগ আসার আগেই ঠেকিয়ে দেবার চেষ্টা।

দেশটি ইতিমধ্যে ক্যান্সারের প্রতিষেধক টিকা আবিষ্কার করেছে। স্বল্প মূল্যে এই টিকা নেয়ার জন্যে প্রতিবছর ২ লক্ষ বিদেশি কিউবায় যায়। এছাড়া কিউবা এইডসের এমন একটি টিকা আবিষ্কার করেছে, যাতে এইড আক্রান্ত মা বাবার সন্তান এইডসমুক্ত হবে।

এক কোটি দশ লাখ মানুষের জন্য দেশটিতে নব্বই হাজার ডাক্তার। প্রতি এক হাজার মানুষের জন্য আটজন ডাক্তার। যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি এক হাজার মানুষের জন্য আড়াই জন ডাক্তার, যুক্তরাজ্যে রয়েছে ২.৭ জন।

চিকিৎসা ক্ষেত্রে কেন এমন সাফল্য জানেন? কারণ কিউবার সবকিছুই করা হয় জনগণের কল্যাণের জন্যে, জনগণের সুখসমৃদ্ধির জন্যে। আর এই ব্যবস্থার নাম হল . . . সমাজতন্ত্র। আপরদিকে পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী পুঁজিবাদী দেশেও কেন মানুষ বিনা চিকিৎসায় মারা যায়? কারণ সেখানে সবকিছু করা হয়—ব্যাবসার জন্যে, ব্যক্তির লাভের লুটের জন্যে।

কিউবার প্রধান প্রধান প্রধান রপ্তানিকারী জিনিসের নাম জানেন? ডাক্তার নার্স এবং ওষুধ, চিনি। আর আমেরিকার প্রধান রপ্তানিকারী পণ্যের নাম জানেন? অস্ত্র গোলা বারুদ গুলি বন্দুক জঙ্গি।

সূত্র: *বিবিসি*

বাংলায় করা এই সারসংক্ষেপটি সোশ্যাল মিডিয়া থেকে পাওয়া। বিবিসি নিউজ, ইন্টারনেটে পড়ার জন্য লিংক: http://www.bbc.com/news/health-35073966। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

দেশ বিদেশের বস্তি জীবন ও স্বাস্থ্য সমস্যা

ধ্রুবজ্যোতি দে

নগরে বাস করেও মানুষগুলি যেন নগরবাসী নয়। মূলবাসীদের কাছে ওঁদের পরিচয় কেবলই বস্তিবাসী। যদিও নগরের অসংগঠিত অর্থনীতির অনেকটা এবং গার্হস্থ্য ও নাগরিক পরিষেবা প্রদানের প্রায় সবটা এঁরাই ধরে রাখেন। অথচ ঝাঁ চকচকে নগরে মূলবাসীদের থেকে স্বতন্ত্র নাগরিক পরিকাঠামোর বাইরে মলিন দারিদ্রক্লিষ্টপরিবেশে বসবাস করেন ওঁরা। কিন্তু তার মানেই কি ওঁরা সবাই বস্তিবাসী? যদি মনে করেন রেললাইনের ধারে, খালপাড়ে বা পরিত্যক্ত জমিতে যাঁরা ঝুপড়িতে থাকেন বা যাঁরা ফুটপাথের বাসিন্দা তাঁরাই বস্তিবাসী তাহলে ভুল করবেন। কেননা সরকারি কর্তৃপক্ষ বা প্রশাসন এঁদের অস্তিত্বই মানতে নারাজ। বস্তি কথাটির সঙ্গে জড়িয়ে রাখা হয়েছে চিহ্নিত, ঘোষিত, স্বীকৃত, বৈধ, বিজ্ঞাপিত ইত্যাদি অভিধা ও তাদের নানাবিধ ব্যাখ্যা। পাঁচ কথার প্যাঁচে প্রশাসনের এই মেনে না নেওয়ার ফলে এঁদের বাসাগুলি থেকে যায় সবসময়েই অস্থায়ী। তাই নগরায়ণ, পরিকাঠামো উন্নয়ন, সৌন্দর্যায়ন, শিল্পায়ন বা আরও রকমারি স্বার্থে এঁরা সবসময়েই উচ্ছেদের সম্মুখীন হন। তাহলে কি আস্তানাগুলি স্থায়ী হলেই ওঁদের ওই বসত এলাকাগুলিকে বস্তি বলা যেত? না, আয়তন ও জনসংখ্যার বিচারে তারও আছে স্থানীয়, জাতীয়, আন্তর্জাতিক, হরেকরকম সংজ্ঞা। আর সেইসব সংজ্ঞার মাপ অনুযায়ী না হলে ওই এলাকাগুলি বস্তি বলে গ্রাহ্য হবে না।

তবে 'ইউনাইটেড নেশন্স'-এর কার্যকরী সংজ্ঞায় আয়তন ও জনসংখ্যা নির্বিচারে বস্তি এলাকার বৈশিষ্ট্য কেমন হবে তার কয়েকটি নির্ণায়ক আছে। সেগুলি হল (১) নিম্নমানের আস্তানা (২) ঘনবসতি ও ঘিঞ্জি আবাস (৩) নিরাপদ পানীয় জলের অপ্রতুলতা (৪) শৌচালয়ের অভাব এবং (৫) অসুরক্ষিত স্বত্বহীন বাসস্থান। এখন কোনো এলাকায় যদি এই নির্ণায়ক বৈশিষ্ট্যগুলির একটিও বর্তমান থাকে তবে স্বাভাবিকভাবেই সেখানকার জনস্বাস্থ্যের অবনতি হতে বাধ্য এবং সেই এলাকা 'ইউনাইটেড নেশন্স'-এর বিচারে অবশ্যই বস্তি। লক্ষণীয় হল দেশ-বিদেশ নির্বিশেষে সব বস্তিতেই এই বৈশিষ্ট্যগুলির কমবেশি উপস্থিতি অবধারিত। এই রচনায় এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা ও ইউরোপের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বস্তির বৈশিষ্ট্য ও স্বাস্থ্য সমস্যা নিয়ে আমরা আলোচনা করব।

এখানে উল্লেখিত অভিধা, সংজ্ঞা ও তাদের ব্যাখ্যা এবং বস্তির জনস্বাস্থ্যে বস্তি নির্ণায়কগুলির প্রভাব নিয়ে *স্বাস্থ্যের বৃত্তে*-র জুন-জুলাই ও অক্টোবর-নভেম্বর ২০১৭ সংখ্যায় আলোচনা রয়েছে।

ধারাভি, মুম্বাই, ভারতবর্ষ

স্লামডগ মিলিয়নেয়ার নামে হলিউড চলচ্চিত্রটির কথা হয়তো অনেকেরই মনে আছে। শিল্পোন্নত ইউরোপের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা তৃতীয় বিশ্বের দারিদ্র পীড়িত মানুষদের সাধারণত কী চোখে দেখেন তা ছবিটির নামকরণ থেকেই বোঝা যায়। *রিডিসকভারিং ধারাভি*-র লেখিকা কল্পনা শর্মা *দি রিয়েল স্লামডগ্স* তথ্যচিত্রের সাক্ষাৎকারে এমনই আক্ষেপ করেছেন। বস্তিবাসীরা বিক্ষোভও দেখিয়েছেন এই ছবিটির বিরুদ্ধে। ভারতের, সম্ভবত এশিয়ারও, বৃহত্তম বস্তি মুম্বাইয়ের ধারাভি ছিল ওই চলচ্চিত্রটির ভরকেন্দ্র, ফলে তথ্যচিত্রটিও ধারাভি নিয়েই আলোকপাত করেছিল ।

১৮শ শতাব্দীতে ধারাভি ছিল মিঠি নদীর মোহনায় ম্যানগ্রোভ জলাভূমিতে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কিছু ধীবর গ্রাম। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এসে মুম্বাই নগর প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল বাসস্থান, জল সরবরাহ ও নিষ্কাশনের সংকট। পরিস্থিতি এমনই তীব্র আকার ধারণ করে যে ১৮৬৯-এ শুরু হল বিউবোনিক প্লেগ-এর মড়ক। ফলে শুধু মুম্বাই শহরেই মারা গেলেন দু-লক্ষ মানুষ। ব্রিটিশ সরকার নেটিভ ভারতীয়দের ও তাদের ট্যানারি ইত্যাদি দূষণকারী কারখানাগুলিকে মূল শহর সীমানার বাইরে উত্তরে জেলেদের গ্রামের দিকে তাড়িয়ে দিল। আর এইভাবে ১৮৮২- তে ধারাভির পত্তন হল।

ধারাভি বস্তি

প্রায় দু-শো হেক্টর এলাকায় দশ লক্ষেরও বেশি মানুষ বাস করেন ধারাভিতে। জনঘনত্ব বাকি মুম্বাই শহরের প্রায় দশ গুণ। ধারাভিতে সমানভাবে রয়েছে বসত ও বাণিজ্যিক উৎপাদনের এলাকা। প্রায় ৮৬ হাজার বাসা রয়েছে ধারাভিতে, বেশির ভাগ এক কামরার। গড়ে ৮-১০জন মানুষ থাকেন প্রতিটি বাসাতে। ভাড়া মোটামুটি মাসে প্রায় ৩০০-৫০০ টাকা। অধিকাংশ বাসাই স্বত্বহীন, অবৈধ। একের ওপর এক, ছোটো ছোটো নীচু বদ্ধ ঘর, নেই শৌচালয়, জলের কল বা আলাদা রান্নার জায়গা। কাচাকাচি ও স্নান করতে হয় ঘরের বাইরে। পাইপ লাইনের জল সীমিত, তাই বস্তির কলে অপেক্ষা করতে হয় দীর্ঘ সময়। এখান ওখানে পাইপের ছিদ্র দিয়ে বেরিয়ে আসা দূষিত জল সংগ্রহ চলতে থাকে, নদী থেকেও জল আনতে হয়। পয়সার বিনিময়ে গণ-শৌচালয়ের ব্যবস্থা আছে, তবে প্রায় ১৪০০ জন পিছু একটি। তাই প্রায়শই হালকা হতে যেতে হয় নদীর পাড় বা রেল লাইনের

লক্ষ্মী ব্যতিক্রম নয়, ধারাভিবাসীরা সাধারণভাবেই লেখাপড়া শেখার প্রতি আগ্রহী ও আস্থাশীল। এঁদের মধ্যে সাক্ষরতার হারও ভালো, প্রায় ৭০ শতাংশ। এবং এঁরা যথেষ্ট উদ্যোগী ও পরিশ্রমী। পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্কগুলি দৃঢ় থাকায় এখানে অপরাধপ্রবণতা কম।

ধার। জল ও শৌচালয়ের অপ্রতুলতা, ময়লা নিষ্কাশনের অব্যবস্থা ও অত্যধিক জনঘনত্বের কারণে আন্ত্রিক, আমাশয়, টাইফয়েড ইত্যাদি জলবাহিত রোগ এখানে বরাবরের সঙ্গী। ১৯৮৬ সালে ধারাভির শিশুদের মধ্যে একবার কলেরা মহামারি আকারে দেখা দিয়েছিল। ইদানীং ওষুধ প্রতিরোধী যক্ষ্মার উপস্থিতি যথেষ্ট সংখ্যায় চোখে পড়ছে। নিত্য রোগভোগের কারণে ধারাভিবাসীদের গড় আয়ু প্রায় ষাট বছর, যেখানে সারা ভারতের জনগণের কথা ধরলে এই আয়ু মোটামুটি আটষট্টি বছর।

বসবাসের জায়গা ব্যতীত প্রায় ৭০০০-টি দোকান ও ১৫,০০০-টি এক কামরার অসংগঠিত গৃহশিল্প আছে ধারাভিতে। এইসব দোকান ও শিল্পের অর্থমূল্য কম নয়, সব মিলিয়ে বাৎসরিক লেনদেন অন্তত কয়েক হাজার কোটি টাকা। মুম্বাই বাদেও ধারাভি পণ্যের বাজার রয়েছে ইউরোপ, আমেরিকা ও মধ্য ভারতের নানা দেশে। ধারাভিতে নানারকম দোকান ছাড়াও রয়েছে চামড়া, কাপড়, গয়না ও মৃৎশিল্প। আর এইসব গৃহশিল্পে ন্যূনতম দূষণ নিয়ন্ত্রণের কোনো ব্যবস্থাই নেই। নেই শ্রমিকদের জন্য কোনো সুরক্ষা ব্যবস্থা। শ্রমিকদের গড় মজুরিও খুব কম—মোটামুটি দৈনিক দেড়শো-দুশো টাকার মতো।

এইসব উৎপাদন-শিল্প ছাড়াও অর্থনৈতিকভাবে ধারাভির আর একটি গুরুত্বপূর্ণ 'শিল্প' হল কঠিন আবর্জনার পুনর্নবীকরণ। সারা মুম্বাই শহর থেকে (প্রায় ৮০% প্লাস্টিকসহ) সংগৃহীত এমন কোনো জঞ্জাল নেই যা এখানে ঝাড়াইবাছাই করে, গলিয়ে নতুন জিনিস তৈরি করা হয় না। যদিও এইসব আবর্জনার মধ্যে থাকে বায়ো-মেডিক্যাল বর্জ্য, রাসায়নিকের পাত্র ও আরও নানারকম বিপজ্জনক বস্তু। তাই এই কাজের মধ্যে লুকিয়ে থাকে দূষক ও জীবাণুঘটিত রোগের প্রবল সম্ভাবনা। তবু এই কাজ করে প্রায় দশ হাজার অদক্ষ শ্রমিক, যাদের অধিকাংশই অপ্রাপ্তবয়স্ক। হাত ঢাকার গ্লাভস বা মুখ ঢাকার মাস্ক তাদের জোটে না।

দি রিয়েল স্লামডগস তথ্যচিত্রে এমন এক জঞ্জাল সংগ্রাহক লক্ষ্মী কুনলে জানিয়েছেন, এইসব বর্জ্যের মধ্যে রয়েছে তিন রকমের বিপদ। প্রথমত, ইঞ্জেকশন বা স্যালাইনের সুচ বা ধারালো জিনিস, যা থেকে এইচআইভি-র মতো জীবাণুরও সংক্রমণ হতে পারে। দ্বিতীয়ত, খারাপ গ্যাস-গন্ধ, যা থেকে অ্যাজমা হতে পারে, আবার জীবাণু থাকার জন্য যক্ষ্মারোগ পর্যন্ত হতে পারে। তৃতীয় বিপদ হল ক্ষতিকারক রাসায়নিক। একবার এরকম কোনো কেমিক্যালের ঝাঁজ লেগে লক্ষ্মীর মুখ লঙ্কাপোড়ার মতো জ্বালা করতে থাকে ও ফুলে যায় এবং তিনি বেশ কিছুদিন অসুস্থ থাকেন। লক্ষ্মীর একটি ১৪ বছরের মেয়ে আছে, শীতল। বিবাহবিচ্ছিন্না লক্ষ্মী কষ্ট করেও শীতলকে স্কুলে পড়াচ্ছেন এবং প্রতি সন্ধ্যাবেলা নিজে মেয়েকে পড়াতে বসেন। প্রত্যাশা একটাই, মেয়ে শিক্ষিত হয়ে যেন এই দুর্দশা থেকে মুক্তি পায়। লক্ষ্মী ব্যতিক্রম নয়, ধারাভিবাসীরা সাধারণভাবেই লেখাপড়া শেখার প্রতি আগ্রহী ও আস্থাশীল। এঁদের মধ্যে সাক্ষরতার হারও ভালো, প্রায় ৭০ শতাংশ। এবং এঁরা যথেষ্ট উদ্যোগী ও পরিশ্রমী। পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্কগুলি দৃঢ় থাকায় এখানে অপরাধপ্রবণতা কম। পরিকাঠামো ভালো থাকলে, বস্তি-নির্ণায়ক বৈশিষ্ট্যগুলির থেকে তা উন্নত হলে এবং আন্ত্রিক, যক্ষ্মা ইত্যাদি লাগাতার অসুস্থতার মধ্যে না পড়লে, এঁরা নিজেদের জীবনের মান যথেষ্ট উন্নত স্তরে নিয়ে যেতে পারতেন।

'ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর পপুলেশন সায়েন্সেস'-এর একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, মুম্বাইয়ের বস্তিবাসীদের প্রায় ৯০% আক্রান্ত হন শ্বাসযন্ত্রের অসুখে, ৪২% পাচনতন্ত্রের সমস্যায় এবং ৩৮% ভোগেন স্থায়ী ব্যথা-বেদনায় (*দি ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস*, ৭.৮.২০১৫)। বোঝাই যাচ্ছে, বাসস্থানের অপর্যাপ্ত পরিকাঠামো এবং অসুরক্ষিত কর্মপরিবেশের কারণে সংক্রমণ, দূষণ ও কাজের চাপের জন্য মানুষজন এভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। সীমিত আয়ের ফলে শ্রমজীবী মানুষ সঠিক সময়ে উপযুক্ত চিকিৎসা করার চেষ্টাও করতে পারেন না। আর সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় শিশুরা। 'ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেল্‌থ সার্ভে-৩ (২০০৫-০৬) থেকে জানা যায় মুম্বাইয়ের বস্তি শিশুদের ৩৬%-এর ওজন বয়সানুপাতে কম এবং ৪৭%-এর বৃদ্ধি ব্যাহত রয়েছে। বস্তি সমেত সামগ্রিক মুম্বাইয়ের শিশুদের ক্ষেত্রে এই হার যথাক্রমে ৩৩%

ও ৪০%। দারিদ্র, অপুষ্টি ও অস্বাস্থ্যকর পরিকাঠামোই এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী।

পরিকাঠামো উন্নতির কথা বলে সরকার এলাকা 'পুনরুন্নয়ন'-এর প্রথম পরিকল্পনা নেয় ১৯৯৭ সালে। আসল উদ্দেশ্য উন্নয়নের নামে স্বত্বহীন বাসাগুলি ভেঙে দেওয়া, বাসিন্দাদের উচ্ছেদ এবং সাংহাই-এর মতো একটি 'বিশ্বমানের আধুনিক শহর' গড়ে তোলা। ২০০৪-এ এজন্য ৫০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। ২০০৭-এ *হিন্দুস্থান টাইম্‌স* লেখে, ধারাভির দু-বর্গ কিলোমিটার জমির দাম যেখানে দশ বিলিয়ন ডলার সেখানে এই বস্তিটাকে দৃষ্টিকটু মনে হয়। অতঃপর পুনরুন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত করার জন্য বিশ্বব্যাপী বিজ্ঞাপন দেওয়া হলে দায়িত্ব পান আমেরিকাস্থিত নগর-স্থপতি মুকেশ মেহতা। ঠিক হয় বস্তির প্রায় ১৭৪ হেক্টর এলাকা জুড়ে তৈরি হবে 'শপিং আর্কেড', পার্ক, বড়ো স্কুল বাড়ি, ঝকঝকে রাস্তা, বহুতল অট্টালিকাসহ উপনগরী। ঠাঁই দেওয়া হবে বৈধ ৫৭ হাজার পরিবারকে যাদের ২০০০ সালের আগেকার স্বত্ব আছে; তাও সর্বাধিক ৩০০ বর্গফুট-এর ফ্ল্যাট, বাকিটা কিনতে হবে নগদে। জমির অন্য (৫৩%) অংশে হবে রিয়েল এস্টেট বাণিজ্য! আর এর থেকে সরকারের আয় হবে দু-হাজার কোটি টাকা। এজন্য ২০০৮-এর শেষের দিকে বস্তির একটি অংশে ঘর ভাঙা শুরু হয়। পুলিস আসে, উচ্ছেদ হন দশ হাজার বস্তিবাসী, কর্মহীন হয়ে যান এলাকার শ্রমজীবী মানুষ। বন্ধ হয় ওই এলাকায় স্বাস্থ্য ও শিক্ষা নিয়ে কাজ করা একাধিক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান।

দাবি আসে—আকাশচুম্বী অট্টালিকা নয়, চাই বহুতল স্নানাগার-শৌচাগার। অত্যাধুনিক অপ্রতুল জল সরবরাহ ব্যবস্থার বদলে চাই সকল বাসিন্দার জন্য পরিশ্রুত জল সংরক্ষণাগার।

সরকারের কাছে যখন উন্নয়ন পরিকল্পনা মানে কেবল কংক্রিটের নির্মাণ ও তা থেকে অর্থাগম, ধারাভিবাসীরা তখন আওয়াজ তোলেন 'বাতিল করো সব পরিকল্পনা, শুরু হোক নতুন ভাবনা'। ২০১৪-তে তাঁদের পাশে এসে দাঁড়ায় মুম্বাই-এর স্বশাসিত সংস্থা 'আর্বান ডিজাইন রিসার্চ ইনস্টিটিউট', বলে, এসো 'ধারাভিকে পুনরাবিষ্কার' করি। সবাইকে জড়িয়ে, সহসৃষ্টি (কো-ক্রিয়েট) হোক উন্নয়ন পরিকল্পনা।

দাবি আসে—

আকাশচুম্বী অট্টালিকা নয়, চাই বহুতল স্নানাগার-শৌচাগার।

অত্যাধুনিক অপ্রতুল জল সরবরাহ ব্যবস্থার বদলে চাই সকল বাসিন্দার জন্য পরিশ্রুত জল সংরক্ষণাগার। বহুজাতিক 'শপিং আর্কেড' নয়, চাই ধারাভি-পণ্যের বহুমুখী বিপণন কেন্দ্র।

চাই স্বল্প ব্যয়ে দূষণহীন প্রযুক্তির সাহায্যে হস্তশিল্পগুলির মানোন্নয়ন।

কেবল ফ্ল্যাট নয়, চাই উপার্জনের উপযোগী কর্মপরিসর।

রাস্তা ও স্কোয়ারগুলি থাকুক মানুষের মিলনস্থল, ছোটোদের গলি ক্রিকেট, বয়স্ক ও মহিলাদের দেখাশোনা, মেলামেশার জায়গা।

এই মানবিক উন্নয়ন আনতে হবে ধাপে ধাপে, স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রয়োজন অনুযায়ী পরিকল্পনামাফিক। কোনোভাবে চাপিয়ে দেওয়া নয়, চাই উন্নয়নে সকলের অংশগ্রহণের অধিকার। কেবল স্বত্ব নয়, চাই নিজেদের জীবনকে নিজে হাতে উন্নত করার অধিকার। সরকার ও কর্পোরেটদের থেকে উন্নয়নের অধিকার ও ক্ষমতা নিজেদের হাতে তুলে নিতে অতঃপর ধারাভিবাসীরা সবাই মিলে গড়ে তুলেছেন অলাভজনক নিগম 'ধারাভি কম্যুনিটি ল্যান্ড ট্রাস্ট'। সকলেরই প্রত্যাশা এই উদ্যোগ সফল হোক। (চলবে) স্বাস্থ্যের বৃত্তে

লেখক সমাজ গবেষক, একটি নগরোন্নয়ন সংস্থার অবসরপ্রাপ্ত আর্থ-সামাজিক পরিকল্পনাবিদ।

Advt.

উৎস মানুষ

বিজ্ঞান, সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা

প্রাপ্তিস্থান:

দীপক কুণ্ডু, ২৯/৩, শ্রী গোপাল মল্লিক লেন, কলকাতা-১২, বই-চিত্র (কফিহাউসের তিন তলা), পাতিরাম, বুকমার্ক, অমর কোলে (বিবাদি বাগ), দিলীপ মজুমদার (ডেকার্স লেন), সুনীল কর (উল্টোডাঙা), কল্যাণ ঘোষ (রাসবিহারী মোড়), সৈকত প্রকাশন (আগরতলা), র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন (বেনিয়াটোলা লেন, কলেজস্ট্রীট), মনীষা গ্রন্থালয় (কলেজস্ট্রীট), বইকল্প, ১৮ বি, গড়িয়া হাট রোড (সাউথ), কলকাতা-৭০০০৩১।

যোগাযোগ: ই-মেল-utsamanush1980@gmail.com

ফোন-৯৮৩০৬৫৯০৫৮/৯৪৩৩৮৮৮৮৬২/৯৮৩১৪৬১৪৫৬

শহরের বাতাস কতটা শ্বাসযোগ্য?

শহরের বাতাস কতটা নিশ্বাস নেবার যোগ্য সে প্রশ্ন এখনও তুলব না আমরা? লিখেছেন **দেবনীল দে**।

চিত্র ১. শহরে ধোঁয়াশা

'আইন তো আছেই! কিন্তু একবারও ভাবব না নিজের সন্তানদের জন্য কী বাতাস রেখে যাচ্ছি! কোন বাতাসে শ্বাস নেবে তারা!', আফশোস করে কথাগুলো বলছিলেন দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের উচ্চপদস্থ কর্তাটি। সেপ্টেম্বর মাসের কথা। পুজোর মরসুম তখন সবে শুরু হওয়ার মুখে। রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদেও প্রতি বছরের মতো রুটিন ব্যস্ততা শুরু হয়েছে। শব্দদূষণ, বায়ুদূষণ রুখতে কী কী পদক্ষেপ করা হবে, তা নিয়ে নিয়মিত বৈঠক হচ্ছে তখন। সেই সময়েই উচ্চপদস্থ কর্তার ওই আক্ষেপ!

সত্যিই তো! নিজেদের জীবনে এত সমস্যা! চারপাশে এত সমস্যা! তার মধ্যে কোন বাতাসে শ্বাস নিচ্ছি, তা কতটা শ্বাস নেওয়ার জন্য স্বাস্থ্যকর, সে সব ভাবার সময় কোথায়! মাঝে মধ্যে দিল্লির মতো দু-একটা ঘটনা ঘটলে তখন নয় কলকাতার বাতাস নিয়ে দু-একটা কথাবার্তা হতে পারে। তখন নয় আবার শহরের বায়ুদূষণ নিয়ে আলোচনা হতে পারে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। বায়ুদূষণের কথা আর কে ভাবে!

অথচ বিশেষজ্ঞেরা জানাচ্ছেন, বায়ুদূষণের মানচিত্রে দিল্লি শীর্ষে থাকলেও কলকাতাও খুব একটা পিছিয়ে নেই। এমনিতে দিল্লির লাগামছাড়া দূষণে যে সেখানকার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা পর্যন্ত ব্যাহত হয়েছে, তা বেশিদিনের ঘটনা নয়। স্কুল বন্ধ রেখে, পার্কিং ফি-এর চারগুণ বৃদ্ধি-সহ একাধিক পদক্ষেপ করে দূষণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মরিয়া চেষ্টা চালিয়েছে দিল্লি প্রশাসন। দিল্লির ঘন কুয়াশা, দেশের রাজধানীকে বায়ুদূষণের মানচিত্রে সর্বাধিক আলোচিত জায়গা করে তুললেও বিশেষজ্ঞেরা জানাচ্ছেন, দিল্লির মতো বাহ্যিকভাবে কলকাতার দূষণ চোখে না পড়লেও সরাসরি শ্বাসযন্ত্রে ঢুকে যায়, এমন ভাসমান ধূলিকণার পরিমাণ ক্রমাগত বাড়ছে। ক্রমাগত, ধারাবাহিকভাবে শহরের হৃদ্‌পিণ্ড দূষণপ্রবণ হয়ে উঠছে। বাতাসে মিশে যাচ্ছে এমন সব ধূলিকণা, যা ক্রমাগত শহরের বাতাসকে বিষিয়ে দিচ্ছে। আর তাতে শ্বাস নিতে নিতে এমন সব রোগের উপসর্গ দেখা দিচ্ছে যে, কয়েক বছর আগেও তা ছিল না। বিশেষজ্ঞেরা এও জানাচ্ছেন, এখনই, এই মুহূর্তে বিষয়টি নিয়ে সতর্ক না হলে শহরের বাতাস কতটা শ্বাসযোগ্য থাকবে, সেটা নিয়ে অদূর ভবিষ্যতেই প্রশ্ন উঠতে পারে।

বাতাসে ক্ষতিকর উপাদানের বাড়া-কমা নির্ভর করে 'এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স' বা বাতাসের গুণমানের সূচকের উপরে। ক্ষতিকর উপাদানের পরিমাণ বাড়তে থাকলে ওই সূচকও বাড়তে থাকে। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের তথ্য অনুযায়ী, বাতাসে পিএম১০ বা ভাসমান ধূলিকণার সহনশীল পরিমাণের মাত্রা হল প্রতি ঘনমিটারে ১০০ মাইক্রন। ১০০ মাত্রা ছাড়ালে শ্বাসকষ্টরোগীদের শ্বাসের সমস্যা

বাতাসে ক্ষতিকর উপাদানের বাড়া-কমা নির্ভর করে 'এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স' বা বাতাসের গুণমানের সূচকের উপরে। ক্ষতিকর উপাদানের পরিমাণ বাড়তে থাকলে ওই সূচকও বাড়তে থাকে।

শুরু হয় ধীরে ধীরে। ওই মাত্রা ২০০, ৩০০ ও ৪০০ মাইক্রনের মাত্রা ছাড়ালে পরিস্থিতি যথাক্রমে 'খারাপ', 'খুব খারাপ' ও 'বিপজ্জনক' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এই মাপকাঠির নিরিখে দেখলে দেখা যাবে, গত দু-মাসে শহরের বাতাসে ভাসমান ধূলিকণার পরিমাণ হামেশাই ২০০, এমনকী, ৩০০-ও ছাড়িয়েছে। অর্থাৎ, শহরের বাতাস 'খারাপ' থেকে ক্রমশ 'খুব খারাপে'র দিকে এগিয়েছে।

শহরের বায়ুদূষণ কীভাবে বাড়ছে, তা বুঝতে নভেম্বরের দিকেই তাকানো যাক! এমনিতে শীতের সময়ে বাতাসে দূষণের পরিমাণ বাড়ে অনিবার্যভাবে। কিন্তু সেই 'অনিবার্য' বৃদ্ধির মাপকাঠিতেও বিষয়টি যে উদ্বেগজনক! রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের তথ্য জানাচ্ছে, গত ৬ নভেম্বর শ্যামবাজারে ভাসমান ধূলিকণার পরিমাণ ছিল ১৩১, মিন্টো পার্কে ১১৯, টালিগঞ্জে ১২০, হাইড রোডে ১৫৩ মাইক্রন! যা সহনশীল মাত্রার (প্রতি ঘনমিটারে ১০০) থেকে বেশ কিছুটা বেশি। ৮ নভেম্বর রাতে ওই দূষণের মাত্রা আরও বেড়েছে। রাত ৮টা নাগাদ ওই দূষণের মাত্রা ছিল ১৮০ মাইক্রন। রাত ১০টায় সেই মাত্রা গিয়ে দাঁড়ায় ২৩১.৭-এ! আর ৯ নভেম্বর সকাল ১০টায় ওই পরিমাণ ছিল ১৭৫.৬ মাইক্রন! তারপর থেকে যত দিন এগিয়েছে, তত ওই মাইক্রনের হিসেব খাতায়-কলমে বেড়েছে। আর আমরা, সাধারণ মানুষেরা শীত কবে জাঁকিয়ে পড়বে, কেন এখনও শীতের আমেজ পড়ছে না, বড়দিনে শীতের আমেজ থাকবে তো, সেই সমস্ত আলোচনা নিয়েই ব্যস্ত থেকেছি!

চিত্র ২. উৎসবের মরশুমে আতসবাজির ধোঁয়া

এ শহরে এখনও যেভাবে মান্ধাতা আমলের কায়দায় কাঠ ও টায়ার জ্বালিয়ে, পিচ গলিয়ে রাস্তা মেরামতি করা হয়, সেটাই বায়ুদূষণের অন্যতম কারণ

এবার আসা যাক ডিসেম্বরের তথ্যে! শীতকালীন উৎসবের মরসুমের তথ্যে! আর ডিসেম্বরের মাত্র কয়েকটি দিনের তথ্যের দিকে তাকালেই বোঝা যাবে, মাত্র একমাসের ব্যবধানে কীভাবে 'খুব খারাপ' হয়ে গিয়েছে শহরের বাতাস, এই 'প্রাণবায়ু মম'! পয়লা ডিসেম্বর বেহালা চৌরাস্তার কথাই ধরা যাক। ওইদিন ওখানে ভাসমান ধূলিকণার পরিমাণ ছিল ২৭৫.৬৭ মাইক্রন! আরেকবার সহনশীল মাত্রাটা মনে করুন! বাতাসে পিএম১০ বা ভাসমান ধূলিকণার সহনশীল পরিমাণের মাত্রা প্রতি ঘনমিটারে ১০০ মাইক্রন। সেখানে ২৭৫.৬৭! সেদিন সল্টলেক ও মোমিনপুরে ভাসমান ধূলিকণার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২০২.৩৩ এবং ২০৫.৩৩। তার পরের দিন, ২ ডিসেম্বর শ্যামবাজারে ওই পরিমাণ ছিল ২৩৮, উল্টোডাঙায় ২৩১ ও মৌলালিতে ২২৪!

এবার ডিসেম্বরের মাঝামাঝি চলে আসুন! দেখবেন, ১৫ ডিসেম্বর শহরে বায়ুদূষণের পরিমাণ ৩০০ ছাড়িয়ে গেল! সেদিন মৌলালি-তে ভাসমান কণার পরিমাণ ছিল ৩২৫.৬৭! এর পাশাপাশি দিল্লির একটা তথ্য রাখুন। চলতি বছরে দিল্লিতে ওই সূচকের মান ছিল ৪৫১! তা হলে আর কতটা পিছনে থাকলাম আমরা? তা হলে এখনও কি আমরা প্রশ্ন তুলব না! এখনও শুধুমাত্র রাজ্য সরকার ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের উপরে নির্ভর করে থাকব? এখনও আমরা পুজোর মরসুম এলেই দ্বিধাহীনভাবে বায়ু দূষিত করে, এমন আতসবাজির খোঁজ করব? নিজেরা কোনো দায়িত্বই নেব না! শুধু দিল্লির মতো যখন ঘটনা ঘটবে, যখন তা নিয়ে ধারাবাহিকভাবে কয়েকদিন সেই ঘটনা নিয়ে সংবাদপত্রে ছাপা হবে বা টেলিভিশনে তা ক্রমাগত দেখানো হবে, শুধু সেই কয়েকটি দিন এটা নিয়ে একটু আলোচনা করব? শঙ্কিত গলায় বলব, 'দিল্লির কী অবস্থা দেখেছ!', কিন্তু তারপর আবার উৎসবের মরসুম পড়তেই ফালাফালা করে দেব শহরের হৃদ্‌পিণ্ড!

আসলে রাজ্য সরকারও যে সচেতন নয়। না হলে বিশেষজ্ঞরা যেখানে বলছেন, এ শহরে এখনও যেভাবে মান্ধাতা আমলের কায়দায় কাঠ ও টায়ার জ্বালিয়ে, পিচ গলিয়ে রাস্তা মেরামতি করা হয়, সেটাই বায়ুদূষণের অন্যতম কারণ, সেখানে ওই কায়দাই ধারাবাহিকভাবে বজায় রাখা হয়! যার জেরে হাঁপানি, সিওপিডি (অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ), এমনকী, ফুসফুসে ক্যান্সারের আশঙ্কাও ক্রমাগত বেড়েই চলেছে।

শিশুরোগ বিশেষজ্ঞেরা জানাচ্ছেন, তাঁরা রীতিমতো উদ্বিগ্ন। উদ্বিগ্ন কারণ, তাঁরা লক্ষ করছেন, আগে যে সকল শিশুদের শ্বাসকষ্টজনিত কোনো সমস্যা হত না, এখন তাদেরও হচ্ছে। তাঁদের চেম্বারে অভিভাবকেরা এমন শিশুদের নিয়ে আসছেন, যাদের শ্বাসকষ্টের কোনো ধাত পর্যন্ত ছিল না। কিন্তু তাতে কার কী! ওই 'শুদ্ধবাণী' হয়তো কোনো সেমিনারে আলোচিত হতে পারে, তা নিয়ে বিদগ্ধ আলোচনা হতে পারে, কিন্তু ব্যক্তিগত, সামাজিক বা প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ? নৈব নৈব চ! বরং এ শহরে বায়ুদূষণ নিয়ে কথা বলা বা ভাবা হয়তো শুধুমাত্রই বিলাসিতা!

তাই দিনের শেষে পর্ষদ কর্তার আক্ষেপটুকুই হয়তো শুধু পড়ে থাকে—'একবারও ভাবব না নিজের সন্তানদের জন্য কী বাতাস রেখে যাচ্ছি! কোন বাতাসে শ্বাস নেবে তারা!' . . . স্বাস্থ্যের বৃত্তে

লেখক সাংবাদিক-প্রাবন্ধিক।

তালা-চাবির গপ্পো

ডা. সব্যসাচী সেনগুপ্ত

দুপুর নাগাদ বাপ্টু এসেছিল বাড়িতে। বাপ্টু এসেছিল আমার ভাঙা হাতের ক্রেপ ব্যান্ডেজ পালটাতে। বাপ্টু, শিলাদিত্য ভাদুড়ী (Shiladitya Bhaduri), আমার বন্ধু। আমি গত এক বছরে এমন চারজন মানুষকে হঠাৎ বন্ধু হিসাবে পেয়ে গেলাম দুম করে, যারা এক লহমায় জীবনটাকে করে দিতে পারে—খুশিয়াল। বাপ্টু, তাদেরই মধ্যে একজন। এই চারজনের মধ্যে আবার, দু-জনের প্রতি আমার অধিকারবোধ কিঞ্চিৎ বেশি। আমার ভালোবাসা, আমার অভিভাবকসুলভ দায়িত্ব, এবং আমার আবদার সামলাতে সামলাতে, বেচারিরা জেরবার। এদেরকে ধুমধাড়াক্কা যখন খুশি ফোন করে—'এই শোন, কলকাতা যাব . . . চব্বিশে . . . দুটো টিকিট কেটে দে দেখি. . .আর শো. . . কাটা হলে ফোন করিস না দয়া করে, আমি ঘুমাব . . . পরে উঠে দেখে নিচ্ছি'—এসব বেমালুম বলে যেতে, আমার একটুও 'বাধো-বাধো' লাগে না। যেন, এইটেই তো স্বাভাবিক, যেন, এইটেই তো বলতে হয়। আমার স্ত্রী, আমাকে বকাবকি করে প্রায়ই এইসব কারণে। তবুও, বেয়াড়া আমি, সে সব মনে রাখতে পারি না কিছুতেই।

সেদিনও, ঠিক সেরকমই ঘটল। দিনটা রবিবার। সময়টা, দুপুর একটা। আমি তখন সদ্য, হাতে প্লাস্টিক জড়িয়ে নাইতে গেছি। একটু আগেই বাপ্টুকে মেসেজ করে জানানো হয়ে গেছে—'ক্রেপ রাতে পালটাস . . . এখন থাক . . . ল্যাদ লাগছে।' সবে মাথায় শ্যাম্পু মেখে, কমোডে বসে বিড়ি ফুঁকছি, হঠাৎ ফোনের রিং। বাপ্টু—'সব্যসাচীদা, আমি যদি নির্লজ্জের মতো, তোমার বাড়ি যাই এখন, তুমি কি রাগ করবে?' মাথা অনেকক্ষণ ধরে ভিজে। জল ঢালতে হবে এইবারে। তিরিক্ষি হয়ে জবাব দিয়েছিলাম—'ধ্যাত্তেরি, যা পারিস কর।'

বাপ্টু এসেছিল। এবং এসেছিল শুধুমাত্র আমার ল্যাদ কাটিয়ে, ক্রেপ বেঁধে দেবে বলে। ক্রেপ বাঁধতে বাঁধতে বাপ্টু গল্প শোনাচ্ছিল। দাদুর গল্প।

বাপ্টুর দাদু, অশীতিপর বৃদ্ধ। বিছানায় শুয়ে থাকে বেশিরভাগ সময়েই। বুড়ো বয়সে আচমকা চানাচুর-প্রীতি জন্মেছে আজব রকমের। একজন আয়া আছে বারো ঘণ্টার। সে দিনেরবেলা দেখভাল করে। আর রাতে বাপ্টুরাই . . . সেই অশীতিপর বুড়ো নাকি, কাল ভর সন্ধ্যেবেলাতে হঠাৎ ধড়মড়িয়ে উঠে, সদর দরজায় তালা মারতে গিছল। বাড়িতে তখন, আয়া ছাড়া আর দ্বিতীয় কেউ নেই। বাপ্টুর বাপ-মা গেছে মুম্বাই। কাকারা দোতলায়, বাপ্টু বাইরে। বুড়ো উঠে দীর্ঘক্ষণ, চাবি হাতে খচরমচর করে চেষ্টা করেছিল তালা লাগাবার। পারেনি। তারপর, একসময় হতাশ হয়ে ক্ষান্ত দিয়েছিল।

অনেক পরে, বাপ্টু বাড়ি ফিরে দ্যাখে, দাদু সদর দরজার তালা লাগবার চেষ্টা করছিল সাইকেলের চাবি দিয়ে। চাবিটা, তখনও তালায় ঝুলছে। এসব কথা, বাপ্টু আমাকে বলতে বলতে হাসছিল। আমার হাতে তখন জড়ানো হচ্ছে ক্রেপ, আমার সমস্ত অস্তিত্ব তখন একাগ্র হয়ে লড়ছে ব্যথার বিরুদ্ধে, আমার মন তখন, ভীষণ মমতার সঙ্গে আমাকে বোঝাচ্ছে—'কিচ্ছু হয়নি। কিচ্ছু হয়নি সব্যসাচী। কিচ্ছুটি হয়নি। হাত ভাঙল তো কী হয়েছে? জীবন এখনও বড্ডো বেশি সুন্দর।' ঠিক এইরকম এক আশ্চর্য মুহূর্তে, বাপ্টুর কথাখানি, আচমকা আমার মন খারাপ করিয়ে দিল।—'ভাবো একবার, সাইকেলের চাবি দিয়ে তালা . . . হ্যা-হ্যা হ্যা-হ্যা', আমার চোখের সামনে দিয়ে হঠাৎ করে কয়েকখানা মুহূর্ত চলে গেল, আমার মনের ভেতর দিয়ে কয়েকখানা কান্না . . .

তখন, সদ্য ডাক্তার হয়েছি আমি। ইমারজেন্সি ডিউটি পড়তে শুরু করেছে টাটকা। গলায় স্টেথো, হাতে এপ্রন নিয়ে, কলেজে হাঁটাহাঁটি করি। যেন—উত্তমকুমার। তারপর একদিন, সেদিন আমার তৃতীয় ইমারজেন্সি বোধ হয় . . . ওয়ার্ডে ঢুকতে গিয়ে দেখি, ইমারজেন্সির ঠিক বাইরেটাতে এক বৃদ্ধা আছাড়িপিছাড়ি কাঁদছে। 'ওগো, আমার যে সব শেষ হয়ে গ্যালো গোওওও, . . . ওগো, আমার যে আর কিচ্ছুটি নেই।' সামনে তার, সস্তা মড়ার খাটিয়াতে, ফুলসজ্জিত এক বৃদ্ধের লাশ। চোখে তুলসি পাতা। গোটা দুয়েক লোক, বোধকরি আত্মীয়ই হবেন, বুড়োর কপালে চন্দন আঁকছেন। আমি কেঁপে উঠেছিলাম। আমি শিউরে উঠেছিলাম। এই-ই তবে মৃত্যু?

এরপর, আস্তে আস্তে আস্তেএএএএএ, ডাক্তার হওয়ার প্রধান পাঠটুকু রপ্ত করেছিলাম আমি। —'রোগীর কষ্টের সাথে একাত্ম হয়ো না, তাহলে নিদান দিতে হাত কাঁপবে।' . . . আমি নির্বিকার চাপড় মেরেছি প্রসূতির জঙ্ঘায়—' চাপ দাও, ঠ্যালো . . . '; আমি অকাতরে বারবার খুঁচিয়েছি রোগীর হাতের শিরা—'মুঠো করো . . . মুঠো করো . . . হাত নড়িও না' আর, ভোররাতে, কলবুকে উঠে, চোখ কচলাতে কচলাতে গিয়ে নিস্পৃহভাবে লিখেছি—'রোগীর হৃদ্‌স্পন্দন নেই, রোগী মরে গেছে।' পার্টিকে ডেকে বলেছি—'তিন ঘণ্টা পরে এসে বডি নিয়ে যেও।' তারপর, পকেটে কলম গুঁজে, মসৃণ হেঁটে পৌঁছে গেছি 'অন-

তবুও, আজও, এখনও এই 'মুখোশ-মুখের' পেছনের আমি, মৃত্যুকে মেনে নিতে শিখিনি একটুও। তবুও, আজও, আমার ভীষণ নিকট কলিগ সুরভি জানে, রোগী মরে গেলে আমি কাঁদি . . .

কল' রুমের বিছানায়। নেপথ্যে তখন ক্রমাগত বেজে গেছে, বিপুল কান্নার কলরব।

তবুও, আজও, এখনও এই 'মুখোশ-মুখের' পেছনের আমি, মৃত্যুকে মেনে নিতে শিখিনি একটুও। তবুও, আজও, আমার ভীষণ নিকট কলিগ সুরভি জানে, রোগী মরে গেলে আমি কাঁদি—খুব গোপনে।

ডাক্তার। মস্তো বড়ো পেশা তাই না? রোগীর জীবন আমাদের হাতের নিদানে। রোগীর আরাম, আমাদের অধীত বিদ্যায়। কিন্তু, এর একটা এক্কেবারে উলটো দিকও আছে বই কী। ভীষণ ভীষণ ভীষণ কটু একটা বিপরীত দিক। আমরাই, শুধুমাত্র আমরাই পারি ঘোষণা করতে—রুগী মরে গেছে। আমাদের, একমাত্র আমাদের কলমই পারে শিলমোহর লাগাতে—মৃত্যুর নির্মম সত্যকে।

কিন্তু কেন বলছি এসব কথা? এসব কথা তো বলার কথা ছিল না আমার। বলতে যে গিছলাম এক্কেবারে ভিন্ন কিছু। তাই থেকে কীভাবে যে এসব এতোল বেতাল চলে এল কলমে!! বাসুদা, বেলালদার মতো গুছিয়ে লিখতে শিখব কবে? আসলে জানেন, বাপ্টুর দাদুর ঘটনাটা, একলহমায়, আমার মাথার ভিতর সব উলটপালট করে দিল। মন বড়ো বিষম বস্তু। এখানে, এক অনুপলে, চলচ্চিত্রের মতো ফুটে ওঠে হাজার রকম ছবি। আর এক পলে, সেই হাজার ছবির মধ্যে থেকে, আলাদা হয়ে ফুটে ওঠে—শতখানিক ফ্রেম।

বাপ্টুর দাদুর কথা শুনে, প্রথমেই যে ছবিটা হাজার ফ্রেমের ভিড়ে, আমার চোখে গেঁথে গেল—সেটা জলপাইগুড়ির। আমার সেদিন ইমারজেন্সি নাইট চলছে। ভোর পাঁচটা বাজে। সঙ্গী স্বস্তিশোভনদাকে, আমি হাতে পায়ে ধরে পাঠিয়েছি রেস্ট নিতে। নইলে সে বেচারি রোগী দেখার ফাঁকেফাঁকে, আমার সঙ্গে আড্ডা মারতে মারতে ভুলেই যাচ্ছিল যে—বয়স হচ্ছে। সারা রাতের ধকলের মাঝে একটু 'লম্বা' না হলে, রুগী দেখতে পারবে না পরের দিন।

একলাই ছিলাম। সকাল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ একটা মারুতি ভ্যান ঢুকল। আর তার মিনিট খানেক পরেই, হন্তদন্ত হয়ে স্ট্রেচার ঘিরে, গোটা তিনেক পার্টি। তার মধ্যে একজন, তক্ষুনি টিকিট বানাতে চলে গেল অভ্যস্ত ভঙ্গিতে—বুঝলাম অ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভার। বাকি পড়ে রইল একটি তরুণ, আর একটি বৃদ্ধা। তরুণটি বিশেষত্বহীন। বৃদ্ধার সাদা শাড়ি, লালপাড়। হাতে একটা চামড়ার ভ্যানিটি ব্যাগ। ডাক্তার তো আমি। জানেনই তো, আমি ডাক্তার। তাই চেয়ার থেকে উঠতে উঠতেই একঝলক দেখে বুঝে গিছলাম—স্ট্রেচারে শায়িত বৃদ্ধ মারা গেছেন। গ্রুপ-ডি-কে বললাম টর্চ আর তুলো আনতে। আর তারপর, সাদা চুল সেই বৃদ্ধা অদ্ভুত রকমের এক অসহায়, ব্যর্থ, ধ্বস্ত, ভেঙে পড়া দৃষ্টিতে দেখে গেলেন, তাঁর আদরের বরের, তাঁর চল্লিশ বছরের স্বামীর চোখের পাতা খুলে, নিষ্ঠুরের মতো তুলো বোলাচ্ছে এক চিকিৎসক। টর্চ মারছে চোখে, নল লাগাচ্ছে বুকে . . . এবং সবশেষে বলছে, 'একটু আগে আনতে পারলেন না? উনি মারা গেছেন।' বৃদ্ধা কীরকম একটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিছলেন। চামড়ার ভ্যানিটি ব্যাগখানা বুকের কাছে, আরও কাছে আঁকড়ে ধরে বলছিলেন, 'একটু দ্যাখো না ভাই . . . সরি . . . ডাক্তারবাবু . . . একটু দেখুন না . . . তুমি . . . আপনি . . . আমার ছেলের মতো বাবা . . . একটু দ্যাখো না . . . ও মর্নিং ওয়াকে যাবে বলে মোজা পরছিল তো . . . একটু দ্যাখো ভাই . . . আমার যে আর কেউ নেই . . . ' আমি দ্বিতীয়বারে, বৃদ্ধার পিঠে হাত রেখেছিলাম . . . আমার হাতে ছুঁয়েছিল লোলচর্ম পিঠের শীতলতা . . . আমি মাথা নীচু করে বলেছিলাম, 'সরি . . . মারা গেছেন।' বৃদ্ধা, ঠিক এর পর থেকেই একদম চুপ হয়ে যান। বৃদ্ধের দেহ, ঢুকিয়ে দেওয়া হয় ভল্টে . . . পোস্টমর্টেম হবে . . . ব্রট ডেড/ মৃতাবস্থায় নিয়ে আসা রোগীর

ক্ষেত্রে সেটাই দস্তুর . . . আর তারপর আমি ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ রোগীকে নিয়ে।

সাতটার দিকে, ভিড় যখন একটু ফাঁকা, সাফাইকর্মী ধোলাই করছে মেঝে, তখন বৃদ্ধা পায়ে পায়ে আবার এলেন ঘরে . . . টুলটা টানলেন . . . বসলেন . . . ভ্যানিটি ব্যাগ তখনও বুকে আঁকড়ে রাখা . . . বাতাসময় ফিনাইলের বাস। বৃদ্ধা মাথা নীচু করে বললেন, 'চল্লিশ বছর . . . ছেলে আছে . . . খুব যত্ন করে . . . কিন্তু আমার যে আর কেউ রইল না . . .।' আমি একটু একটু করে বুঝতে পারছিলাম বৃদ্ধার দহন।

তবুও, আমরা জানব—আমাদের আর কেউ রইল না। . . . এরা কি কখনো, কোনোদিনও 'সে' হয়ে উঠতে পারবে? এরা ভালোবাসবে খুব, কিন্তু বুঝবে না আমার গলা খকখক মানে জানালা বন্ধ করে দিতে হবে, এরা যত্ন নেবে খুব, কিন্তু বুঝবে না, . . .

আমি, আপনি, আমরা সব্বাইই, দিব্যি তো আছি। আমাদের ঘর ভর্তি লোক, আমাদের ফোনবুক ভরা নাম্বার।

কিন্তু, আসলে, আমরা যে বড়োই, বড্ডো বেশিরকমই, জীবনসঙ্গী নির্ভরশীল। একদিন-না-একদিন, কেউ-না-কেউ, আগে তো চলে যাবই। হয় আমার বউ, নয় আমি। হয় আপনার স্বামী, নয়তো আপনি। সেই দিন, সেই-ই-ই দিন, ঠিক কতটা একলা হব আমরা? আমার ছেলে হয়তো-বা আমার বেডপ্যান ধরে দেবে, আপনার পুত্রবধূ পালটে দেবে আপনার শাড়ি। তবুও, কিছুমাত্র কি অভাব মিটবে? তিরিশ . . . চল্লিশ . . . পঞ্চাশটা বছর যার সাথে ঘর করা, যার সাথে হাজার আঁচড়া-আঁচড়ি, হাজার ঝগড়াঝাঁটির পরেও—'আর ভাত দেব? . . . কতবার বলেছি গ্যাসটা সাবধানে জ্বালবে' বলা, সেই-ই-ই লোকটা যেদিন হারিয়ে যাবে এক লহমায় . . . কোনো এক চিকিৎসকের একটা কথাতে যেদিন আমি-আপনি জানব—

'আর শালা হাজার চিৎকার করি, ভাত না খাই, বা, চামড়া লাল করে চিমটি কাটি কষকষিয়ে . . . তাও সে ফিরবে না।'

সেই দিন কেমন হবে আমাদের? আমাদের ছেলে এসে বলবে,'বাবা সোয়েটার পরো।' আমাদের বউমা এসে বলবে,'মা, ব্লাউজটা ছেড়ে দিন, কেচে আনি।' তবুও, আমরা জানব—আমাদের আর কেউ রইল না। এদের, এই ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে যে আমাদের চল্লিশ বছরের ফারাক . . . এরা কি কখনো, কোনোদিনও 'সে' হয়ে উঠতে পারবে? এরা ভালোবাসবে খুব, কিন্তু বুঝবে না আমার গলা খকখক মানে জানালা বন্ধ করে দিতে হবে, এরা যত্ন নেবে খুব, কিন্তু বুঝবে না, বেগুন, আলু, মুলোর সঙ্গে বড়ি না দিলে আমি খেতে পারি না . . . তারপর একদিন হঠাৎ, কোনো এক ভোরে অথবা কোনো এক বিকেলে, ধড়মড়িয়ে উঠে তালা লাগাতে যাব সদর দরজার কড়া দুটোতে . . . বিড়বিড়িয়ে বলব, ' সন্ধ্যে হল, তবু কেউ তালা লাগাবে না . . . কারুর যদি নজর থাকে . . . চোর ঢুকবে ঘরে . . . ' আর তালা লাগাতে লাগাতেই ভাবব—আর তো কেউ এসে বলবে না, ' তুমি সরো দেখি, যাও . . . চা খাও গিয়ে, ঠান্ডা হচ্ছে' আর নাতির খ্যাঁকখ্যাঁক হাসির মাঝে আবিষ্কার করব—এত্ত বয়স হল, তবুও, কোন তালা যে কোন চাবিতে খোলে, ঠাহর হল না আজও। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. সব্যসাচী সেনগুপ্ত, এমবিবিএস, উত্তরবঙ্গের একটি সরকারি হাসপাতালের ডাক্তার।

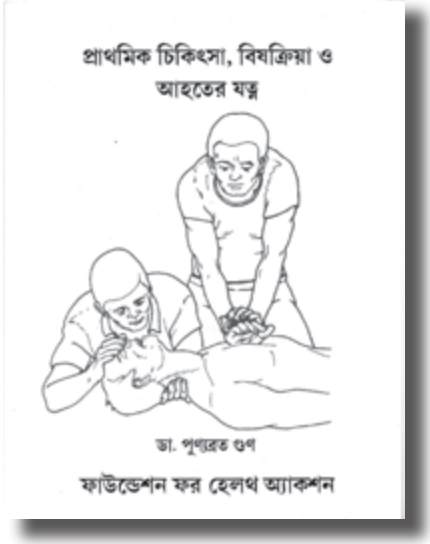

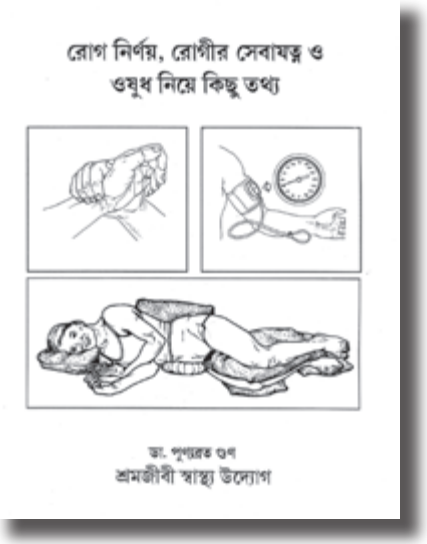

Advt.

চিঠি

সম্পাদকের প্রতি পত্র

স্বাস্থ্যের বৃত্তে বহুদিন ধরে পড়ে আসছি, এবং পত্রিকাটি আমার চেনাজানা মহলে ছড়িয়ে দিচ্ছি—প্রতি সংখ্যায় ২৫-৩০ কপি এভাবে মানুষের কাছে পৌঁছে দিই আমি স্রেফ নিজের তাড়না থেকে। তাই এ নিয়ে দু-একটা কথা বলছি, সেগুলো ছাপতেই হবে এমন দাবি আমার নেই। কিন্তু লেখকরা যদি একটু বিষয়টা নিয়ে ভাবেন তো ভালো হয়।

ডা. গৌতম মিস্ত্রী আমার খুব প্রিয় লেখক, কেননা তাঁর লেখা থেকে অনেক কিছু জানতে পারি। কিন্তু লেখার গতি অনেক সময় আমার মতো সাধারণ পাঠককে নিরুৎসাহ করতে পারে, এমন ভয় হয়। যেমন অক্টোবর-নভেম্বর ২০১৭ সংখ্যায় লেখাটা পড়া শুরু করে, প্রায় দেড় পৃষ্ঠা শেষ পড়েই মনে হচ্ছে ৭ পৃষ্ঠা কখন শেষ করব। ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়ছি। আবার লেখাটা পড়াও ছাড়তে পারছি না। কারণ বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ, প্রয়োজনীয় ও সময়োপযোগী। ৭ পৃষ্ঠা পড়া যখন শেষ করব তখন হয়তো প্রথম পৃষ্ঠায় লেখক কী বলতে চাইলেন তা ভুলে যাব। তাহলে পড়ার লাভ কী হবে? অনেক দিন আগে পড়েছিলাম Principle of good writing। লেখক বলেছিলেন, কোনো তথ্য যদি কাউকে দিতে হয় তবে এভাবে দিন—গৌরচন্দ্রিকা এড়িয়ে চলুন, ভারী শব্দ, অলংকার যুক্ত শব্দ ব্যবহার কম করুন, 'আমি পণ্ডিত লেখক' বা পাণ্ডিত্য আছে একথা বোঝায় এমন কোনো শব্দ বা বাক্যবন্ধ এড়িয়ে চলুন—ইত্যাদি ইত্যাদি ।

এযাবৎ ডা. মিস্ত্রী-র সব লেখাই মনোযোগ দিয়ে পড়েছি। জানি উনি অত্যন্ত দরদ দিয়ে আমাদের প্রয়োজনীয় গুরুত্বপুর্ণ সময়োপযোগী লেখাগুলো লেখেন। কিন্তু পাঠক যদি ক্লান্ত হয়ে পড়ে, মূল ভাব-কথা-রস যদি গ্রহণ করতে না পারেন তবে লেখা ততটা কাজে লাগে না। আবার এটাও ঠিক প্রত্যেকের-ই লেখায় স্টাইল আলাদা। রাম যেভাবে লেখেন রহিম সেভাবে লেখেন না। আবার শ্যাম যে জিনিস যেভাবে পড়েন যদু সে জিনিস সেভাবে পড়তে অক্ষম বা অনীহাগ্রস্ত। একজনের পড়া বিষয়ক বোধ যতটুকু অন্যজনের তা নাও থাকতে পারে। তাই লেখককে ঠিক করতে হবে আমি কাদের জন্য লিখছি, তার পড়ার সময় কতটা, বোধ কতটুকু থাকতে পারে ইত্যাদি ইত্যাদি। বলতে চাইছি লেখাটা সহজ হোক, 'বঙ্কু' ইত্যাদি গল্প-কথা এড়িয়ে সরাসরি বিষয়বস্তুতে আসুন। আমি অল্প সময়ে আপনার দেওয়া তথ্য জানতে চাই। আমি আপনার লেখা সাত পৃষ্ঠাই পড়ব। গল্প থাকলে থাকুক, কিন্তু তা একটু কম জায়গা নিক। আমাকে এই পত্রিকার প্রতিটি লেখা পড়ে শেষ করতে হবে সে কথাটাও আপনাকে ভাবতে হবে। এটা ঠিক বুঝতে পারি হাজারও ব্যাস্ততার মধ্যেও ডা. মিস্ত্রী অত্যন্ত দরদ দিয়ে লেখেন। আমাদের বিষয়টা বোঝানোর জন্যও ভীষণ আন্তরিক। তাই বলছি সোজাসুজি বিষয়বস্তুতে চলে আসুন।

আপনার লেখার বিষয়টা উদাহরণ ধরে আমি বুঝতে চাই, কীভাবে কোন স্টাইল-এ লিখলে আমি বা আমরা বুঝতে পারব তা নিয়ে আপনার বা আপনাদের সঙ্গে আমাদের কথোপকথন কতটা প্রয়োজনীয়। আপনার বর্তমান লেখার স্টাইলটায় আমার অসুবিধা হচ্ছে। লেখার শেষে 'মোদ্দা কথা গুলো আর একবার' লেখার প্রয়োজন কেন হল? কারণ আপনার নিজের-ই সংশয় আছে, লেখাটা হয়তো বা জটিল করে ফেললাম। তাই আমাদের কাছে বিষয়টা সহজ করার জন্যও 'মোদ্দা কথা' বলতে হল।

আরেকটা কথা। তথ্যসুত্র দেওয়ার কি কোনও দরকার আছে? কারণ কোনো বিষয়ের স্পেশালিস্টের এই ম্যাগাজিন পড়ে কিছু বুঝবেন, তা তো নয়। তাঁর জন্য আলাদা জার্নাল আছে। আর আমরা সাধারণ পাঠকেরা তো ডাক্তারবাবুদের বিশ্বাস-ই করি। কারণ আমরা জানি ডাক্তারবাবু ১৭টি নয় ১৭০টি বা তার বেশি বই পড়েই ডাক্তার বাবু হয়েছেন।

ধন্যবাদসহ
আশিষ
নবদ্বীপ

লেখকের বক্তব্য

১. লেখার স্টাইল লেখকের সাবলীল বৈশিষ্ট্য, আরোপিত নয়। মন্দ লাগলে দুঃখ পেতে পারি, পাঠকের ভালো লাগানোর চেষ্টা করতে পারি মাত্র।

২. যে লেখাটি নিয়ে আশিস বলেছেন, সেই লেখার বিষয়বস্তুটি আমার মতে বেশ জটিল, অনেক এমবিবিএস ডাক্তারদের কাছেও মনে হয় অজানা। সাধারণ মানুষ ছোটোগল্পের মতো এক দমে পড়ে বুঝে যাবে এমনটা আমার মনে হয়নি। সেইজন্য শেষে সারাংশ দেওয়া। এই বিশেষ নিবন্ধটি আসলে নিজের প্রফেশনের পাঠকদের কথা ভেবে লেখা, যাদের পেশাগত দক্ষতা ব্যবহার করে একটি পাঠ্যপুস্তকের চ্যাপটারের মতো করে বিশ্লেষণ করবেন, সামাজিক অপপ্রয়োগের বিষয়ে ভাববেন, এমনটাই ভেবেছি।

ডা. গৌতম মিস্ত্রী

স্বাস্থ্যের বৃত্তে; ৩৬তম সংখ্যা (অক্টোবর-নভেম্বর ২০১৭)-তে অজস্র মুদ্রণপ্রমাদ ছিল। আমরা এজন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত ও ক্ষমাপ্রার্থী। ভবিষ্যতে এরকম ভুল এড়াতে সমস্তরকম প্রচেষ্টা নেওয়া হবে।